আকাশ-ভরা * সূর্য-তারা

নিমাই ভট্টাচার্য

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৬৪

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

বন্ধুবর যশস্বী সঙ্গীত শিল্পী

শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র'কে—

নিমাই

নিউ দিল্লী

এই লেখকের অন্যান্য বই :

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান
অ্যালবাম
সাব-ইন্সপেক্টর
পেন ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড ক্লাশ ফ্রেণ্ড
মেমসাহেব
ককটেল
রবিবার
মোগলসরাই জংশন
পিকাডিলী সার্কাস
ম্যাডাম
ভালোবাসা
ডার্লিং
সোনালী
ইওর অনার
হরেকৃষ্ণ জুয়েলার্স
ওয়ান আপ টু ডাউন
নিমন্ত্রণ
ডিপ্লোম্যাট
এ-ডি-সি
ডিফেন্স কলোনী
রিপোর্টার
কেরানী
শেষ পারানির কড়ি
প্রবেশ নিষেধ
চিড়িয়াখানা

ব্যাচেলার
তোমাকে
রাজধানীর নেপথ্যে
ভি-আই-পি
যৌবন নিকুঞ্জে
অনুরোধের আসর
রাজধানী এক্সপ্রেস
প্রিয়বরেষু
ইনকিলাব
পার্লামেণ্ট স্ট্রীট
উইংকমাণ্ডার
গোধূলিয়া
কেয়ার অব ইণ্ডিয়ান এম্বাসী
বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত
ভায়া ডালহৌসী
নাচনী
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র
সেলিমচিস্তি
ইমন কল্যাণ
হকার্স কর্ণার
অন্যদিন
রিটায়ার্ড
ম্যারেজ রেজিস্টার্ড
পথের শেষে
মনে মনে

'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥'……

জীবনে অনেক কিছু করেছি। যা করিনি, তা হচ্ছে বাপ-ঠাকুরদার পদাঙ্ক অনুসরণ। সংসারের আর পাঁচজনের মতো ডালহৌসী স্কোয়ারে চাকরি নিলাম না। পরমাত্মীয়দের বিয়েতে বরযাত্রী গেলাম না, বৌভাত খেলাম না। একটা তাঁতের শাড়ী বা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি বা টেবিল ল্যাম্পও প্রেজেন্ট করতে পারলাম না। অফিসের পশ্চিমী দারোয়ানের কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার করে জামাই ষষ্ঠীর দিন সিল্কের পাঞ্জাবি চড়িয়ে অরক্ষণীয়া শালীকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি করার দুর্লভ সুযোগও এলো না জীবনে।

আরো অনেক কিছুই হলো না এই জীবনে। জিমন্যাষ্টিক প্লেয়ারদের মতো এক আঙ্গুলের 'পর সমস্ত দেহের ভর রেখে বাসে চড়ে ঘুরে বেড়ানো দেখাতে পারলাম না, পাঁচ টাকা ইনক্রিমেন্টের জন্য দেড় বছর ধরে আন্দোলন করতে পারলাম না, সাত্ত্বিক ভোজপুরী ব্রাহ্মণ পুলিশ কনষ্টেবলের পবিত্র লাঠির ঠেঙানি খেয়ে শহীদ হওয়াও সম্ভব হলো না। ধাপার কপি, বনগাঁর কাঁচাগোল্লা, কেষ্টনগরের সর ভাজা, মালদার ফজলিও কপালে জুটল না। বিজয়া দশমীর পর গুরুজনদের প্রণাম করে নারকেলের ছাপা সন্দেশ না খেতে পারার জন্যও কি কম দুঃখ হয়?

এসব কিছুই হলো না কিন্তু বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের বাংলাদেশে থাকলে আরো কিছু কিছু সম্ভাবনা ছিল। শিক্ষাবিদ হলে শ্রমিকদের মতো তিন-শিফট-এ কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেতাম, সর্বত্যাগী রাজনীতিবিদ হলে বিনা রোজগারেও বেশ মেজাজের সঙ্গে সঙ্গে সংসার চালাতে পারতাম, উদ্‌ভ্রান্ত শ্রমিক নেতা হলে আমার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও অপগণ্ড ভাইপো-গুলোকে কল-কারখানার মালিক নিশ্চয়ই জোর করে চাকরি দিত। পোড়া কপালে তাও হলো না।

মোদ্দাকথায় ঠিক মধ্যবিত্ত ভদ্দরলোক বলতে যা বোঝায়, আমি তা হলাম না বা হতে পারলাম না। কেউ বলেন ম্লেচ্ছ হয়েছি, কেউ বলেন গোল্লায় গেছি। আমি নাকি যা-তা খাই, যেখানে-সেখানে যাই, যাঁর-তাঁর

সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। অভিযোগগুলো যে মিথ্যে, তা নয়। কখনও জীবিকার তাগিদে, কখনও জীবনের প্রয়োজনে মিশেছি অনেকের সঙ্গে। মিশেছি বড়লোক, ভদ্দরলোক, ছোটলোকের সঙ্গে। মিশেছি পুরুষের সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে। তবে তারা সবাই মানুষ। জীবনের টানে, জীবিকার গরজে ঘুরেছি সারা ভারতবর্ষ, ঘুরেছি এশিয়ার নানা দেশ। পাড়ি দিয়েছি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা।

ছোট্ট ঘরে নিশ্চিন্ত জীবন আমি পাইনি। ঘরের থেকে বেরিয়ে এসে বিরাট আকাশের তলায় আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। ঘরের কোণের ছোট্ট প্রদীপের আলোয় অদৃষ্টের খেয়াঘাট খুঁজে পাইনি। শেষে আকাশ-ভরা সূর্য-তারার আলোয় চিনে নিয়েছি সে খেয়াঘাট। তাইতো মনে হয় ভালবেসেছি আকাশ-ভরা সূর্য-তারাকে। আশঙ্কা হয় এই আকাশের কোন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছোট্ট ঘরের নিশ্চিন্ত পরিবেশে নিজেকে কোনদিনই বন্দী করতে পারব না।

আমার এই 'আকাশ-ভরা সূর্য-তারা'র সঙ্গে যদি অন্য কারুর আকাশের সূর্য তারার কোন মিল থাকে, তবে তা নিতান্তই দুর্ঘটনা।

—নিমাই ভট্টাচার্য

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, মেম-সাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককটেল, ম্যাডাম, তোমাকে, ডিফেন্স কলোনী, উইং কমাণ্ডার লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়তো আরো বেরোবে, সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

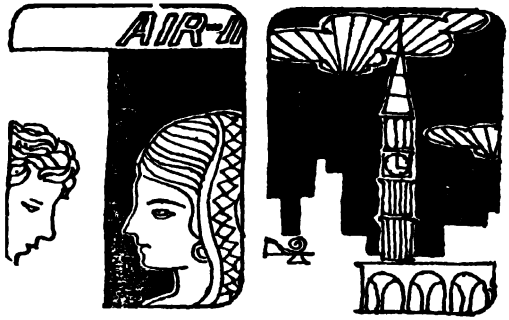

আদিকালে রাজা-মহারাজা, বাদশা-শাহেনশার দরবারে সভাকবির দল থাকতেন। তাঁরা রাজার কথা লিখতেন, ছোটরাণী, বড়রাণীর কথা লিখতেন। লিখতেন আরো কিছু। লিখতেন রাজ্যের কথা, রাজ্যশাসনের কথা, রাজ্যের খ্যাতিমান পুরুষদের কথা। আর লিখতেন রাজার মহানুভবতার, রাণীমার ঔদার্যের কাহিনী। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মৃগয়ার কথা বা অষ্টাদশী পূর্ণযুবতী রাজকুমারীর রূপ-যৌবনের কাহিনী নিয়েও সভাকবির দল লিখতেন। সময়ে-অসময়ে আরো অনেক কিছু লিখতে হতো। শত্রুপক্ষের নিন্দা করে কাব্যরচনা করতে হতো সভাকবিদের। কখনো-কখনো সুরাপানের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা নিয়েও লিখতেন তাঁরা। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য দেহপসারিণী নাচিয়ে-গাইয়েদের নিয়েও চমৎকার কাব্যরচনা করে গেছেন অতীত যুগের ঐ সভাকবির দল।

অতীতকালের ইতিহাসের টুকরো-টুকরো ছেঁড়া পাতাগুলো খুঁজলে সভাকবিদের বিস্ময়কর প্রতিভার আরো অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে। এইসব সভাকবিদের টুকরো টুকরো কাব্যকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখেছেন। সে ইতিহাস আমরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করেছি, কিন্তু ভুলে গেছি সভাকবিদের। শুধু যে তাঁদের আমরা ভুলে গেছি, তা নয়। সভাকবিদের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের অবজ্ঞা আমাকে বড়

পীড়া দেয় ; সভাকবিদের রচনা নিয়ে আমরা হৈ-চৈ করি, কিন্তু তাঁদের জীবনে কোনদিন সুখ-দুঃখ ভালবাসা-ব্যর্থতা নিয়ে আলো-আঁধারের খেলা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। সভাকবিরা সব কিছু লিখেছেন, লেখেননি শুধু নিজেদের কথা। হয়তো নিজেদের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার জ্বালায় তাঁরা জ্বলে-পুড়ে মরেছেন, কিন্তু সে কাহিনী লেখার সুযোগ কোনদিন তাঁদের জীবনে আসেনি।

আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও হচ্ছি এ-যুগের সভাকবির দল। আমরাও রাজার কথা লিখি, মন্ত্রীর কথা লিখি, রাজার মহানুভবতা রাণীমার ঔদার্যের কথা, রাজ্যের কথা, রাজার বন্ধুদের কথা লিখি। অতীতের সভাকবিদের কাব্যের মতো আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টারদের টুকরো-টুকরো রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই আজকের ইতিহাস লিখবেন। আগামী দিনের মানুষ সে ইতিহাস হয়তো মুগ্ধ হয়ে পড়বেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কেউ স্মরণ করবেন না রিপোর্টারদের।

সভাকবিদের টুকরো-টুকরো কাব্যের মধ্য দিয়ে যেমন অতীতের বহু মানুষের জীবন-কাহিনীর একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়, আজকের দিনের রিপোর্টারদের টুকরো-টুকরো রিপোর্টের মধ্য দিয়েও তেমনি বহু মানুষের জীবন-কাহিনীর একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে উঠবে। রিপোর্টারদের কলমে বা টাইপ-রাইটারে আজ যিনি ছাত্রনেতা বা ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম কর্মী, আগামী দিনে তিনিই হয়তো মন্ত্রী। মাঝখানে তাঁর কারাবরণের কথা ও মুক্তিলাভের খবরও ঐ একই টাইপ-রাইটারে লেখা হয়। শুধু কি তাই? ঐ একই রিপোর্টার হয়তো মন্ত্রীর পদত্যাগ, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তার তদন্ত, তদন্তের খবর ফাঁস, সরকার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট নাকচ, মন্ত্রীর দলত্যাগ, আবার পুরনো দলে ফিরে আসা, মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ, তাঁর প্রতিদিনের কাজ-কর্ম, এমন কি তাঁর প্রেম, বিয়ে বা নার্সিংহোমে পুত্রসন্তান জন্মের খবরও ঐ রিপোর্টারের কলমেই লেখা হয়। অদৃষ্টের পরিহাসে ঐ মন্ত্রীর মৃত্যুর

সংবাদও হয়তো একই রিপোর্টারের টাইপ-রাইটারে লেখা হবে। দীর্ঘদিনের বিস্তীর্ণ পরিবেশে লেখা এইসব টুকরো-টুকরো খবর জুড়লে নিশ্চয়ই একটা জীবন-কাহিনীর পূর্ণ রূপ দেখা যাবে। রিপোর্টারের দল সবার অলক্ষে—হয়তো নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে অসংখ্য মানুষের জীবন-কাহিনী লিখে যান। অতীতের সভাকবিদের মতো আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও লেখেন না শুধু নিজেদের কথা, নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস।

তাইতো নির্মলদার ইতিহাস হয়তো কেউ জানবেন না, কেউ এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন না, কেউ তাঁর জীবনের আনন্দ বেদনার উষ্ণতা অনুভব করবেন না নিজেদের অন্তরে। নির্মলদার জীবন-নাট্যে আমি অভিনয় করিনি, ড্রপ সিন টানিনি, উইং স্ক্রীনের পাশ থেকে প্রম্পটারের কাজ করিনি, গ্রীনরুমেও যাইনি। তবে অদৃষ্টের পরিহাসে দুটি প্রাণীর জীবন-নাট্যের চরম কয়েকটি দৃশ্যের একমাত্র দর্শকরূপে আমি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

নির্মলদা ও নির্মলাবৌদি দীর্ঘ ও বিচিত্র জীবনপথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এক পান্থশালা থেকে আরেক পান্থশালায় গিয়েছেন ওঁরা দুজনে। আমি তাঁদের সহযাত্রী হবার গৌরব অর্জন করিনি, কিন্তু ওঁদের জীবনপথের প্রান্তসীমায় এক পান্থশালায় মাত্র কয়েকটি স্মরণীয় রাত্রির জন্য আমি সঙ্গী হয়েছিলাম। ধন্য হয়েছিলাম ঐ দুটি মহাপ্রাণের কাছে এসে। ওঁদের দুজনের ভালবাসার আত্মতৃপ্তিতে আমি আমার অন্তর ভরিয়েছিলাম। অতর্কিত আক্রমণ করে ঐ দুটি প্রাণীর স্নেহ-ভালবাসা দশ হাতে লুট-পাট করে নিয়েছি, কিন্তু তার বিনিময়ে শুধু ক'ফোঁটা চোখের জল ছাড়া আর কিছু দিতে পারিনি আমি।

নির্মলাবৌদি তাঁর হৃদয়-ঔদার্যে আমার হৃদয়-কার্পণ্য ক্ষমা করলেও আমি নিজে বুকের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করি। কাজ-কর্মের অবসরে নিজের অজ্ঞাতে আজও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে আমার বুকটাকে ভারী করে তোলে, মনটাকে পীড়িত করে। মানুষকে আমি

ভালবাসি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি ধন্য হয়েছি, কিন্তু কেন জানি না মানুষের যত কাছে এসেছি, ততই তাঁদের সুখ-দুঃখের ঝঙ্কার এমন তীব্রভাবে আমার অন্তরে বেজেছে যে, বেদনা অনুভব করেছি।

গত বছরের মতো এবারও লণ্ডন এয়ারপোর্টে শুধু একটি প্রাণীই আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন। বন্ধুবান্ধব বা বান্ধবীদের আমার যাবার কথা জানাই, কিন্তু ঠিক কবে কোন্ ফ্লাইটে ক'টার সময় কোথা থেকে লণ্ডন পৌঁছাচ্ছি, সে কথা জানাই না। লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে আমি শুধু একটি প্রাণীকেই দেখতে চাই, তাঁকে প্রণাম করতে চাই, তাঁর বুকে আত্মসমর্পণ করতে চাই। লণ্ডনে পৌঁছে প্রমথ কয়েকটি আনন্দ বেদনাতুর মুহূর্তে আমাদের দুজনের মাঝখানে হাইফেনের মতো অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি কল্পনা করতে পারি না। তাইতো এবারেও সবাইকে জানিয়েছিলাম কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভার করতে লণ্ডন আসছি। কিন্তু দাস ফার, নো ফারদার। শুধু নির্মলাবৌদিকে লিখেছিলাম—

'বৌদি,

আমি আসছি। ১১ই জুন সুইস এয়ার ফ্লাইটে জুরিখ থেকে বিকেল চারটে কুড়িতে লণ্ডন পৌঁছাব। ক'দিন আবার দুজনে কাঁদব, গাইব, বেড়াব। কেমন? প্রণাম নিও।

তোমার ঠাকুরপো।'

চিঠি পাবার পরই নির্মলাবৌদি আমার জন্য ঘর দোর ঠিক করতে লেগে পড়েছিলেন। আমি ঠিক যা যা চাই, যা কিছু ভালবাসি, তার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন আমি আসার ক'দিন আগেই। এগারোই জুন বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটে বাজতে না বাজতেই নির্মলাবৌদি এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছিলেন। আমি কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকতেই দেখলাম বেরুবার রাস্তায় দেওয়ালে মাথাটা ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার নির্মলাবৌদি।

আমি হাত তুলে ইশারা করলে উনি একটু হেসে হাত তুলে প্রত্যুত্তর দিলেন আমাকে। তারপর কয়েক মিনিট পরে কাস্টমস চেক্ শেষ করে বেরিয়ে আসতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলাম নির্মলাবৌদিকে। বৌদিও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। দু এক মিনিট পরে ক'ফোঁটা চোখের জল আমার গালে গড়িয়ে পড়তে খেয়াল হলো বৌদি নিশ্চয়ই কাঁদছেন। হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে বৌদির চোখের জল মুছিয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'ছিঃ বৌদি, তুমি কাঁদছ? এত দূর থেকে ছুটে এলাম তোমার কাছে সে কি তোমার চোখের জল দেখবার জন্য?'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বৌদি বললেন, 'না, না, ঠাকুরপো কাঁদছি কোথায়?'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না বৌদি।' আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে গেল। তারপর বললাম, 'এতদূর থেকে ছুটে আসি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আনন্দ পাবার জন্যে, তোমাকে কাঁদাবার জন্যে নয়।'

চোখের জল বন্ধ হলো, কিন্তু চোখের মণিদুটো স্থির করে এমন উদাস দৃষ্টিতে বৌদি চাইলেন যে, আমার বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে খুব ধীর স্থির আস্তে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমিও যেমন আমাকে পেয়ে আনন্দ পাও, আমিও তেমনি তোমাকে কাছে পেয়ে অনেক শান্তি পাই। আজ তুমি ছাড়া আমার ঘর আলো করার আর কে আছে বলতে পার?'

'ঠিক বলেছ বৌদি। তোমার ঘরে, তোমার মনে, তোমার জীবনে আর কোনদিন সূর্যের আলো পড়বে না বলে তুমি আমার মতো একটা মাটির প্রদীপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ?'

'তুমি মাটির প্রদীপ হলেও আমার এই জমাট বাঁধা অন্ধকার জীবনে তার অনেক প্রয়োজন, অনেক দাম। তাই না ঠাকুরপো?'

আর বেশি কথা না বলে এয়ারপোর্ট থেকে বৌদির বাসায় গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডান দিকের ঘরে ঢুকতেই টেরিলের

ওপর নির্মলদার কলম, পেন্সিল, টাইপ-রাইটার, নোট বই, হাতঘড়ি আর একটা ছবি দেখতে পেলাম। বছর পাঁচেক আগে যেদিন সন্ধ্যায় এই বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করি, সেদিনও ঠিক এমনি করেই সাজানো ছিল। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রও ঠিক এমনিই ছিল। আজকের সঙ্গে সেদিনের বিশেষ কোন পার্থক্যই ছিল না। তবে হ্যাঁ, সেদিন এই ঘরের মালিক নির্মলদা ছিলেন, আজ তিনি নেই। আর শুধু একটা পরিবর্তন নজরে পড়ল। সেদিন নির্মলদার ফটোটায় ফুল চন্দন ছিল না, আজ ছিল। পাঁচ বছর আগে যেদিন এসেছিলাম, সেদিন নির্মলাবৌদি নির্মলদাকে পূজা করতেন, আজ পূজা করেন তাঁর ঐ ফটোটাকে। নির্মলদার টাইপ-রাইটার একটু খুললাম। ফটোটাকে হাতে তুলে নিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর ধীরে-ধীরে অজস্র ধারায় নেমে এল চোখের জল। আমাকে সান্ত্বনা জানাবার শক্তি বৌদির ছিল না। তিনিও আমারই মতন অতীত স্মৃতির ঝড়ে পথ হারিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো!'

'কি বৌদি?'

'পাঁচ বছর আগে প্রথম যেদিন এ-বাড়িতে তুমি এসেছিলে সেদিনের কথা মনে পড়ে?'

নির্মলদার স্মৃতিতে আমার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। মুখে কোন উত্তর দিতে পারিনি, শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ, মনে পড়ে। বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে নির্মলদার ফটোটার মুখোমুখি হয়ে শুধু পাঁচ বছর আগের কথাই নয়, আরো অনেক কথা, অনেক স্মৃতি আমার মনে সেদিন ভীড় করে এসেছিল।

আমি ঠিক নির্মলদার সহকর্মী না হলেও আমাদের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতা, ভ্রাতৃত্বের ভাব ছিল। বহু ট্যুরে আমরা দুজনে একসঙ্গে থেকেছি, বহু ঐতিহাসিক খবর দুজনে একসঙ্গে কভারও করেছি। দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা বয়সের পার্থক্য থাকায় খুব গভীরভাবে নির্মলদাকে কাছে টানতে পারিনি। আমি কলকাতা ছাড়ার পর

শুনলাম নির্মলদা হঠাৎ অন্য একটা কাগজের ফরেন করেসপনডেন্ট হয়ে কায়রো গেছেন। বছর দুই পরে বেইরুটে এক বন্ধুগৃহে নির্মলদার সঙ্গে আমার দেখা। তারপর দুজনের দেখা হয় যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। দুজনেই নন্ অ্যালাইনমেন্ট কনফারেন্স কভার করতে গিয়েছিলাম। একই হোটেলে প্রায় পাশাপাশি ঘরে ছিলাম আমরা দুজনে।

নির্মলদাকে নানাভাবে নানা জায়গায় দেখেছি। দেখেছি কাছ থেকে, দেখেছি দূর থেকে। বেশ লাগত নির্মলদাকে। ওঁর হাসি-খুশিভরা মুখখানা আমাকে অনেক সময়েই অনুপ্রেরণা দিত। বহু বিষয়ে নির্মলদার আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোনদিন কোন অবস্থাতেই মেয়েদের বিষয়ে তাঁর কোন আগ্রহ দেখতে পাইনি। তাছাড়া নির্মলদার আর একটা বৈশিষ্ট্য আমার কাছে একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার ধরা পড়েছিল। মাঝে মাঝেই উনি কোথায় যেন তলিয়ে যেতেন, অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে খুঁজে পেতাম না। সন্দেহ হতো হয়তো কোন রহস্য আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা বিভিন্ন কাগজে কাজ করলেও নিজেদের মধ্যে পারিবারিক হৃদ্যতার মতো মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুখে-দুঃখে পাশাপাশি না চললে আমাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল। এই তো বিজয়দার বোন উমার বিয়েতে ওদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে তমাল বা পূর্ণেন্দু যা করল, তা দেখে কি কেউ ভাবতে পারল ওরা ঐ পরিবারের কেউ নয়? কেউ কি জানতে পারল ওদের কাগজের মধ্যে দারুণ লড়াই? রিপোর্টারদের লেখার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এই তো মান্নার বাবা মারা গেলে বলাইদা যা করলেন বা অধীরদার মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলে দেখা থেকে শুরু করে সবকিছুই তো রমেনদা করলেন, কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না ওঁরা সহকর্মী পর্যন্ত নন। রিপোর্টারদের মধ্যে এমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকা সত্ত্বেও কোন প্রবীণ রিপোর্টারকেও নির্মলদার বিয়ের জন্য অনুরোধ করতে দেখিনি।

আমার বেশ একটু আশ্চর্য লাগত। নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করতাম, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেতাম না। দীর্ঘদিন পরে স্বয়ং নির্মলদার কাছ থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম।

বেলগ্রেডে যখন নির্মলদার সঙ্গে দেখা হলো, তখন উনি লণ্ডনে পোস্টেড। তাই লণ্ডন যাবার পথে আমি নির্মলদার সহযাত্রী হলাম। পথে ক'দিনের জন্য দুজনেই বার্লিন গেলাম। কেম্পিনিস্কি হোটেলে দুজনে একই ঘরে ছিলাম। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের একত্রে বার্লিন বাস এক বিচিত্র গাঁটছড়া বেঁধে দিল আমাদের মধ্যে। দুটি মানুষের মধ্যে পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক গড়বার জন্য সতেরো দিন মোটেই দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় করে মেশবার জন্য আমার আর নির্মলদার মধ্যে এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তাই তো বার্লিন ত্যাগের আগের দিন নির্মলদা হঠাৎ আমাকে বললেন, 'বাচ্চু, তুই তোর লণ্ডনের হোটেল রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দে।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন নির্মলদা?'

'কেন আবার? তুই আমার কাছেই থাকবি।'

হোটেলের রিসেপশন কাউণ্টারে টেলিগ্রামটা দেবার সময় নির্মলদাও একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। কাকে, কোথায়, কিজন্য পাঠালেন, তা বুঝতে পারলাম না। ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে লণ্ডন পৌঁছবার পর জেনেছিলাম ঐ টেলিগ্রামটা নির্মলাবৌদিকে পাঠিয়েছিলেন।

লণ্ডন এয়ারপোর্ট কাস্টমস থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন সুদর্শনা মহিলা ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে নির্মলদার হাত থেকে টাইপ-রাইটার আর কেবিন-ব্যাগটা নিয়ে নিলেন। তারপর কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে, টানা চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কোনদিন আমাকে শান্তি দেবে না?'

সামনের দিকে এগোতে এগোতে একটু হেসে অবাক হয়ে নির্মলদা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল তো?'

'আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? আজকে তোমার ফেরার কথা?'

'কেন, টেলিগ্রাম পাওনি?'

'নিশ্চয়ই, একশোবার পেয়েছি, কিন্তু তোমার না সোমবার আসার কথা?'

একগাল হাসি হেসে নির্মলদা বললেন, 'ওঃ, এই কথা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কথা।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম সোমবার নির্মলদার লণ্ডন ফেরার কথা ছিল এবং ক'দিন যে দেরী করে আসছেন, সে খবরও জানাননি। স্বাভাবিকভাবেই বৌদির সেজন্য চিন্তা হয়েছে। ট্যাক্সির কাছে এসে নির্মলদার খেয়াল হলো আমার সঙ্গে বৌদির পরিচয় করিয়ে দেননি। বৌদির ডান হাতটা টেনে ধরে বললেন, 'রাধা, তোমার সঙ্গে বাচ্চুর পরিচয় করিয়ে দিইনি।'

নির্মলদার দিকে ফিরে বৌদি বললেন, 'সে-সব কাণ্ডজ্ঞান কি তোমার আছে?' এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এস ভাই, ট্যাক্সিতে ওঠো।'

তিনজনে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সির মধ্যে আমাদের অনেক কথা হয়েছিল, সে-সব আর আজ মনে নেই। তবে মনে আছে বৌদি একবার বাঁকা চোখে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে পরে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিয়ে করেছ?'

'না বৌদি।'

'বিয়ে কোরো না।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার? বিয়ে করলে তো আমারই মতো তাঁকেও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।'

উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনের হেণ্ডন সেণ্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে আমার দিন-গুলো বেশ কাটছিল। এত ভাল আমি কাটাতে চাইনি, কিন্তু অদৃষ্টের যোগাযোগে এড়াতে পারিনি। হিসাব-নিকাশে ভগবানের ভুল নেই; সেদিনের সব আনন্দের জের সুদে-আসলে তিনি আজ আদায় করছেন।

কিন্তু আমি অসহায়।

নির্মলদা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যেতেন। আমি তিনবার বেড-টি খেয়েও উঠতে চাইতাম না। বৌদি কাজ-কর্মের ফাঁকে-ফাঁকে এক-একবার হাঁক মারতেন, 'ঠাকুরপো, উঠুন ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেল।' আমি কোন জবাব না দিয়ে বালিশটাকে আরো একটু আদর করে জড়িয়ে পাশ ফিরে শুতাম। শেষকালে বৌদি এসে ধাক্কা দিতে শুরু করতেন। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর আমি পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কিছু বলছেন?'

চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে, মুখের চারপাশে গাম্ভীর্যের ভাব এনে বৌদি বলতেন, 'বাপরে, বাপ, তোমরা এত ঘুমোতেও পার!'

'সকালবেলায় উঠতে না উঠতেই বহুবচন দিয়ে গালাগালি দিতে শুরু করলেন।' তারপর বৌদির মুখটা কাছে টেনে নিয়ে কানে-কানে ফিস ফিস করে বলতাম, 'কেন, নির্মলদারও বুঝি খুব বেশি ঘুম?'

চট করে বৌদি মুখটা টান দিয়ে বলতেন, 'বাচ্চু! কানটি মলে দেব।'

'উইথ প্লেজার। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

বৌদি আমার কথায় কান না দিয়ে উঠে যেতে গেলেই আমি তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে টান দিয়ে কাছে টেনে নিতাম।

'জানেন তো বৌদি, প্রাইম মিনিস্টারকেও রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।'

বৌদি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বলতেন, 'রেখে দাও তোমাদের রিপোর্টারী চালিয়াতি। মাঝে দু'বছর ছাড়া আজ আঠারো বছর ধরে রিপোর্টার দেখছি। ওসব ভয় আমাকে দেখিও না।'

শেষ পর্যন্ত দুজনেই মিটমাট করে নিতাম। বৌদি একটা গান শোনালেই আমি উঠে পড়তাম।

কাজ-কর্ম সেরে আমার ফিরতে রাত হতো, কিন্তু নির্মলদা সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসতেন। খুব জরুরী কাজ না থাকলে সন্ধ্যার পর কোনদিন তিনি বেরুতেন না।

আমি ফিরলে তিনজনে একসঙ্গে ডিনার খেতে বসতাম। খেতে বসে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আলোচনা শেষ করে উঠতে-উঠতে অনেক রাত হতো। কিন্তু তখনও আমাদের আসর ভাঙত না। ফায়ার-প্লেসের ধারে আমরা দুজনে সিগারেট টানতাম, আর বৌদি শোনাতেন গান। একটা নয়, দুটো নয়, ডজন-ডজন গান গাইতেন বৌদি। এত গান শোনার পরও হয়তো নির্মলদা বলতেন, 'রাধা, সেই গানটা শোনাবে?'

'কোন্ গান?'

'সেই যে—নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।'

বৌদি কোন উত্তর দিতেন না, শুধু ভাব-ভরা চোখে একবার চাইতেন নির্মলদার দিকে। তারপর গাইতেন গান।

কবে কখন ও কেন বৌদিকে 'তুমি' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম, তা আজ মনে নেই। মনে আছে শুধু সেই ক'টি দিনের স্নেহভরা মধুর স্মৃতি। নির্মলদার ঔদার্য ও বৌদির স্নেহে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওদের দুটি জীবনের মাঝে আমিও আমার একটা ঠাঁই খুঁজে পেলাম।

ক'দিন থাকার পরই জানতে পারলাম বৌদির নাম কৃষ্ণা। একদিন রাত্তিরে কথায়-কথায় হঠাৎ নির্মলদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বৌদিকে রাধা বলে ডাকেন কেন?'

'কেন আবার? পরস্ত্রীকে তো এর চাইতে ভাল নামে ডাকা যায় না।'

মুহূর্তের মধ্যে বৌদির মুখটা লাল হয়ে উঠল, দুজনের দৃষ্টি-বিনিময়ও হলো। আমি এ-সব নজর করেছিলাম, কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। বৌদির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। তবে তার জন্য আশ্চর্য হইনি, কারণ লণ্ডনপ্রবাসী কোন মেয়েই সিঁদুর পরে না বললেই চলে।

বছর দেড়েক পর রাষ্ট্রপতির ব্রিটেন-সফর কভার্ করার জন্য আমি লণ্ডন গেলাম রাষ্ট্রপতির সফর শেষে ক'দিন নিরিবিলি লণ্ডনবাস করার জন্য আমি আবার হেণ্ডন সেণ্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে বৌদির

সংসারে আশ্রয় নিলাম। সেবার একটু ভাল করে খেয়াল করে দেখলাম। ড্রয়িং-রুমে রাত্তিরের গানের আসর ভাঙার পর দুজনকে দুটি ঘরে চলে যেতে দেখলাম। গভীর রাতে চুরি করেও দেখেছি, দেখেছি দুজনকে দু'ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতে। মনে একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই খটকা, তার বেশী কিছু নয়। ইতিমধ্যে বৌদি নির্মলদার স্ত্রী বলে আমি তাঁর নাম দিলাম নির্মলা। ডিনার-টেবিলে এই নামকরণ-উৎসবের সময় দুজনেই একটু মুচকি হেসেছিলেন। বোধকরি এই নামকরণ-উৎসবের পরই নির্মলদা ও নির্মলাবৌদি স্থির করেছিলেন, আর দেরি করা ঠিক নয়। তাই তো রাত্তিরে ফায়ার-প্লেসের ধারে বসে নির্মলদা ওঁদের দুজনের অতীত জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

হাওড়া মধুসূদন পালচৌধুরী লেনে নির্মলদা ও নির্মলাবৌদিদের বাড়ী প্রায় পাশাপাশি। দুটি পরিবারের মধ্যে গভীর হৃদ্যতাও ছিল। শৈশবে নির্মলদার মা মারা গেলে কিছুকাল বড়পিসির তদারকেই ছিলেন। বড়পিসির বিয়ে হবার পর নির্মলদার জন্য তাঁর বাবা বড়ই চিন্তায় পড়লেন। তখন নির্মলাবৌদির ঠাকুমা বললেন, 'আরে, এর জন্য আবার চিন্তা কি? ও আমার কাছেই থাকবে।'

তখন নির্মলনার বয়স আট কি নয় হবে। পরে নির্মলদাদের সংসারে তাঁর কাকিমা এসেছিলেন, কিন্তু এই মাতৃহীন শিশুটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। নির্মলদা ঐ ঠাকুমার স্নেহছায়ায় থেকে গেলেন। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলে নির্মলদা নিজেদের বাড়িতে থাকলেও আত্মার যোগাযোগটা কমল না। দুনিয়ার সবাই শুধু এইটুকুই জানত, কিন্তু কেউ জানত না ঐ অতগুলো মানুষের ভীড়ের মধ্যেও দুটি আত্মা সবার কল-কোলাহল থেকে বহুদূরে নিজেদের একটা ছোট্ট দুনিয়া রচনা করেছে। রিপন কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে পাস করার পর নির্মলদা ইকনমিক্সে এম-এ পড়বার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেন। মাস ছয়েক পরে হাওড়া ব্রীজের কোণায় এক দুর্ঘটনায় নির্মলদার বাবা মারা গেলেন। ঠাকুমার স্নেহের স্পর্শে

ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালবাসায় সে-দুঃখও নির্মলদা ভুলেছিলেন। কিন্তু রেজাল্ট খুব ভাল হলো না, সেকেণ্ড ক্লাস পেলেন।

এদিকে রেজাল্ট বেরুবার আগে থেকেই নির্মলদা পাড়ার দত্তদার সূত্রে ডেইলি টাইমস পত্রিকায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন। রেজাল্ট বেরুবার পর পাকাপাকিভাবে রিপোর্টারের কাজে লেগে পড়লেন।

তিন বছর পর নির্মলাবৌদিও বি-এ পাস করলেন, কিন্তু বাড়ির কেউ এম-এ পড়াতে চাইলেন না। সবাই বললেন, আরো পড়ালে ভাল পাত্র পাওয়া মুশকিল হবে। পাত্র-নির্বাচন-পর্ব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এলে নির্মলদা আর দেরি করলেন না। একদিন একটু আড়ালে ঠাকুমাকে বললেন, 'আম্মা, এ বিয়ে দিও না। কিন্তু সুখী হবে না।'

ঠাকুমা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন রে?'

ঠাকুমার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু নির্মলাবৌদির মা কিছুতেই রাজী হলেন না। স্ত্রীর চাপে পড়ে নির্মলাবৌদির বাবাও আপত্তি করলেন। নির্মলাবৌদি অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু কিছু ফল হয়নি। বন্ধু-বান্ধব নির্মলদাকে পরামর্শ দিয়েছিল নির্মলাবৌদিকেও নিয়ে বম্বে বা দিল্লী মেলে চেপে পড়তে, কিন্তু নির্মলদা রাজী হননি। শুধু বলেছিলেন, 'তা হয় না রে। যাঁদের দয়ায় আমি এতদূর এসে পৌঁছেছি, তাঁদের এ-সর্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

পরবর্তী সাতাশে শ্রাবণ মাঝরাতের এক লগ্নে এঞ্জিনিয়ার সুকুমারবাবুর সঙ্গে নির্মলাবৌদির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে-বাড়ির রোশনাই আলোর চেকনাইতে কেউ জানল না দুটি আত্মা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নির্মলাবৌদি সুকুমারবাবুর হাত ধরে হাজারিবাগ রওনা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্মলদা ছুটি নিয়ে বম্বে রওনা হয়ে গেলেন। বম্বের ডেইলি এক্সপ্রেসের এডিটর মিঃ রঙ্গস্বামীর সঙ্গে একবার একটা প্লেনের উদ্বোধনী-যাত্রায় একত্রে জাপান গিয়েছিলেন। নির্মলদাকে তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল এবং একটা ভাল অফারও দিয়েছিলেন। তখন সে-অফার নেওয়া নির্মলদার পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু অতীতের সেই

সূত্র ধরেই আজ উনি বম্বে গেলেন। সপ্তাহ খানেক বম্বে থাকার পর মিঃ রঙ্গস্বামী জানালেন, দিল্লী বা বম্বেতে কোন ওপেনিং নেই, তবে কায়রোতে স্পেশাল করেসপনডেন্টের পোস্টটা খালি আছে। নির্মলদা হাসিমুখে সে অফার গ্রহণ করে পনেরো দিনের জন্য কলকাতা ফিরে এলেন।

পনেরো দিন বাদে আম্মাকে প্রণাম করে নির্মলদা বি-ও-এ-সি-র প্লেনে কায়রো রওনা হলেন। তিন বছর বাদে কায়রো থেকে মস্কো বদলি হবার সময় একমাসের জন্য হোম লিভ পেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণা বিহীন হাওড়ার কোন টান না থাকায় দেশে আসেন নি। আবার তিন বছর মস্কোয় কাটালেন নির্মলদা। তারপর বদলি হলেন লণ্ডনে।

'...জানিস বাচ্চু, তখন সবে লণ্ডন এসেছি। একদিন ইণ্ডিয়া হাউসের এক রিসেপশন থেকে ফেরার সময় অকস্মাৎ চ্যারিং ক্রশ টিউব স্টেশনে রাধার সঙ্গে দেখা। ওর বিয়ের আট বছর পরে ওকে লণ্ডনে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তোর বৌদি সে রাত্তিরে আর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল না, আমার সঙ্গে এল। আট বছরের জমাট বাঁধা ইতিহাস দুজনে দুজনের কাছে তুলে ধরলাম। হাওড়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকায় আমি কিছুই জানতাম না, জানতাম না বিয়ের দেড় বছর বাদে জীপ দুর্ঘটনায় সুকুমারবাবু মারা গেছেন। বিধবা হবার পর তোর বৌদির কোন প্রতিবন্ধক এল না। বাবা, মা, আম্মা সবাই মত দিলেন। থাক, বিলেতে গিয়েই পড়াশুনা করুক। তারপর একদিন ও লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স থেকে পাস করে বেরুল। তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দুজনে মিলে অনেক ভেবেছি, অনেক আলোচনা করেছি, অনেক কথা বলেছি, অনেক কথা শুনেছি। শুধু কি তাই? দুজনে মিলে অনেক চোখের জল ফেলেছি। রিজেন্ট পার্কের বেঞ্চগুলো আজও সে চোখের জলে ভিজে আছে। ভাবতে-ভাবতে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনে ঘর বেঁধেছি, আর এই তিনটি বছর স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে চলেছি দুজনে।'

নির্মলদা একটা পাঁজর-কাপানো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। ঠোঁট

কামড়াতে কামড়াতে বৌদিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হয়তো আমারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল কিন্তু ঠিক মনে নেই।

'...যাকে সারা জীবন ধরে নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছি, যার রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশিয়ে সন্তানের হাসিমুখ দেখবার ছবি এঁকেছি মনে মনে, তাঁকে নিয়ে এই অভিনয় করা যে কি অসহ্য, সে কথা তুই বুঝবি না বাচ্চু।'

উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরলেন নির্মলদা। বললেন, 'বিশ্বাস কর বাচ্চু, আজ আর তোর কাছে মিথ্যা বলব না।...মাঝে মাঝে সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তোর বৌদির ঘরে ঢুকে পড়েছি। দু-একদিন হয়তো হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু তারপর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে। কখনও-কখনও আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তোর বৌদি চুরি করে আমার পাশে শুয়ে থেকেছে, আমাকে আদর করেছে, আমার মুখে মুখ রেখে কেঁদেছে, কিন্তু তবুও আজ পর্যন্ত তার বেশী এগুতে পারিনি।'

নির্মলদা হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর কিছু বলতে পারলেন না, থেমে গেলেন। চোখের জলটা মুছতে মুছতে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো একটা কথা বলব?'

আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। মাথা নেড়ে বললাম, 'বলুন।'

'তোমার দাদাকে আর আমাকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে, তাই না?'

'তুমি কি ভেবেছ বৌদি, আমি ভাটপাড়ার পণ্ডিত, না কি পাষাণ?' একটু থেমে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম, 'আমাকে আরো একটু দুঃখ না দিলে তুমি বুঝি তৃপ্তি পাচ্ছ না বৌদি?'

বৌদি নির্মলদার ওপাশ থেকে উঠে এসে আমার চোখের জল মুছিয়ে নিলেন। বললেন, 'লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো, দুঃখ কোরো না। তুমি যে আমাদের জন্য চোখের জল ফেলছ, তাতেই আমাদের অনেক দুঃখ কমে গেছে। তাছাড়া তুমি ভিন্ন আর কেউ তো আমাকে এমন করে বৌদি ডাকেনি, এমন মর্যাদা তো আর কেউ দেয়নি, আমি তো

আর কাউকে এমনভাবে ঠাকুরপো বলে ডাকবার অধিকার পাব না, তাই তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

বৌদির হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'ছি, ছি, বৌদি, এ কি কথা বলছ?'

পরের দিন নির্মলদা আর কাজে বেরুলেন না, আমিও আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বাতিল করে দিলাম। লাঞ্চের পর তিনজনে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে মার্কেটিং করে কাটালাম সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা। রাত্তিরে পিকাডিলীর ধারে একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে হাইড পার্ক কর্নারে আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম।

রাত্রে ফিরে এসে নির্মলদা দেখলেন বিকেলের ডাকে একটা প্লেন কোম্পানির লণ্ডন-মস্ট্রিলের উদ্বোধনী-যাত্রার অতিথি হবার আমন্ত্রণ এসেছে। নির্মলদা বললেন, 'বাচ্চা তুই ক'টা দিন থেকে যা, আমি ঘুরে এলে দিল্লী যাস।'

পরের দিন আমি আমার এডিটরকে একটা টেলিগ্রাম করে জানালাম, লণ্ডন ডিপারচার ডিলেড স্টপ রিচিং ডেলহি নেক্সট উইক।

তিনদিন পর রাত দশটার সময় আমি আর নির্মলাবৌদি নির্মলদাকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে এলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনেই বেশ ক্লান্ত ছিলাম। টেলিভিসনের সামনে বসে গল্প না করে দুজনেই শুয়ে পড়লাম, লেট নাইট নিউজটাও শুনলাম না।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে খবরের কাগজটা খুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বৌদি একটা বিকট চিৎকার করে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম। বৌদির মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে দেখি জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি ফ্রিজ থেকে কয়েক বোতল ঠাণ্ডা জল এনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে-দিতে খবরের কাগজের 'পর নজর পড়তেই দেখলাম, যে প্লেনে নির্মলদা রওনা হয়েছিলেন, সে প্লেন লণ্ডন থেকে টেকঅফ্ করার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অতলান্তিকের গভীর গর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্লেনের

কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেছে, কিন্তু একটি যাত্রীরও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অনেক ঔষধ-পত্র ডাক্তার-নার্স করবার পরও বৌদি ষোল ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, জ্ঞান হবার পর একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি বৌদি। শোকে-দুঃখে বৌদি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি একবিন্দু জল পর্যন্ত স্পর্শ করলেন না। সপ্তাহ খানেক পর বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমার বুকিংটা এবার করে নাও। আর কতদিন তোমাকে আটকাব।'

আমি আপত্তি করছিলাম, কিন্তু বৌদি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, 'না ভাই ঠাকুরপো, তুমি আর আমার সংস্পর্শে থেকো না। হয়তো আমার সংস্পর্শে থেকে এবার তোমারও কোন সর্বনাশ হবে।'

দুদিন পর আমি দিল্লী রওনা হলাম। অনেক আপত্তি করা সত্ত্বেও বৌদি এয়ারপোর্টে এসে আমাকে বিদায় জানিয়ে গেলেন। প্রণাম করে বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বৌদি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার দাদার স্মৃতি নিয়ে এই লণ্ডনেই থাকব, আর কোথাও গিয়ে আমি শান্তি পাব না। তুমি তাই আমাকে ভুলো না। মনে রেখো এই ঝড়ের রাতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। যন্ত্রচালিতের মতো প্লেনে উঠে পড়লাম। বোয়িং ৭০৭-এর তীব্র গর্জন আমার কানে এল না, বার-বার শুধু মনে পড়ল বিকট চিৎকার বৌদি ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

পালামের মাটিতে পা দিয়েই বৌদিকে আমার পৌঁছানো সংবাদ দিলাম। ক'দিন পর বৌদির একটা উত্তর পেলাম :

'ভাই ঠাকুরপো,

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দেবার পর জীবনে সব চাইতে প্রথম অনুভব করলাম, আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা, বন্ধুহীন, প্রিয়হীন।

অনুভব করলাম, আমার অন্তরের শূন্যতা। আজ মনে হচ্ছে স্বার্থপরের মতো তোমাকে ধরে রাখলেই ভাল হতো; মনে হচ্ছে তোমার নির্মলদার জন্য যদি আর একজনকে চোখের জল ফেলার সঙ্গী পেতাম, তবে অনেক শান্তি পেতাম।

আজ বেশ বুঝতে পারছি কে যেন অলক্ষ্যে বসে আমার জীবনটা নিয়ে খুশীমতো খেলা করছে। বেশ বুঝতে পারছি তাঁরই ইচ্ছায় আমার মনের রং বদলায়। কখনো মেঘে-মেঘে ছেয়ে যায়, কখনো সোনালী রোদে ঝলমল করে ওঠে, আবার কখনো গোধূলির বিষণ্ণ রাঙা আলোয় ভরে যায়। আমি আর কিছুই ঠেকাবার চেষ্টা করি না, কিছুরই বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা কোরো না। জীবন দেবতা যখন যেদিকে নিয়ে যাবেন, আমি নিঃশব্দে সেদিকেই যাব। তবে আমার সংস্পর্শে দুটি নিরপরাধ মানুষের সর্বনাশ হওয়ায়, আজ তোমার জন্য বড় ভয় হয়।

বাচ্চু, একদিন তারকার দীপ্তি আমারও ছিল, কিন্তু তবুও বিশাল আকাশের কোলে কেন ঠাঁই হলো না বলতে পার? বলতে পার কেন কক্ষচ্যুত তারকার মতো উল্কার জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে বেড়ালুম পৃথিবী ময়? বলতে পার কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে এজন্মে না হোক, অন্ততঃ আগামী জন্মে তোমার নির্মলদাকে পেতে পারি? ভালবাসা নিও।

তোমার অভাগা বৌদি।'

তমাল দত্তকে চেনেন না, এমন জীবিত কি মৃত কোন বাঙালী আছেন বলে অন্ততঃ আমি জানি না। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, হাওড়া হাটের ভীড়ে, হাজরা পার্কের মহতী জনসভায়, মহাজাতি সদনে, রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলনে, টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ায়, মোহনবাগান টেণ্টে, ইডেন গার্ডেনে টেস্ট ম্যাচের ভীড়ে, তারকেশ্বরের মেলায় অথবা নিউ দিল্লী কালীবাড়ী বেঙ্গলী ক্লাবের বার্ষিক উৎসবে, বোম্বে শিবাজী পার্কে বাঙালীদের নববর্ষ উৎসবে বা মাদ্রাজে গৌড়ীয় মঠের কোন অনুষ্ঠানে, যে-কোন নারী-পুরুষকে জিজ্ঞাসা করুন, তমাল দত্তকে চেনেন ?

আপনার এই প্রশ্ন করার জন্য ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা প্রথমে অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকাবেন। তারপর বলবেন, চিনি না মানে ? সে আমাদের ফ্যামিলী ফ্রেণ্ড। অর্থাৎ ভদ্রলোকের বিধবা মা, ভদ্রলোকের স্ত্রী, ভদ্রলোকের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা বোন, ভদ্রলোকের ভাই, ছেলেমেয়ে—সবার সঙ্গে তমাল দত্তের গভীর ভাব, গভীর ভালবাসা।

পুরী এক্সপ্রেসের থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে, দিল্লী মেলের এয়ার-কণ্ডিসনড্ ফার্স্ট ক্লাশ কুপেতে বা এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং ৭০৭-এ বা বি-ও-এ-সি ভি-সি টেন-এ চড়ে পাশের বাঙালী যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, তমাল দত্তকে চেনেন ? আগের মতন ঠিক একই জবাব পাবেন। এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যে, পিছনের সারি থেকে মিঃ রবার্টসন বললেন, ইউ আর টকিং অফ টমাল ডাট্‌টা ?

—দ্যাটস্ রাইট।

—হি ইজ এ গুড ফ্রেণ্ড অফ মাইন। একটু ঢোক গিলে মিঃ রবার্টসন একথাও বলতে পারেন ইন ফ্যাক্ট ডাট্‌টা না এলে ইভনিং যেন ইভনিং-ই মনে হয় না।

কোয়াণ্টাস ফ্লাইটে করাচী থেকে রোম যাবার পথে যদি কোনদিন মিস পেনসিলভেনিয়ার সঙ্গে দেখা হয় তবে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ তমাল দত্তের কথা। দেখবেন, কি রোমাণ্টিকভাবে উত্তর দেয়।

'এতবড় 'ভারতবর্ষ'টা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন-তিনবার ঘুরলাম। চমৎকার দেশ কিন্তু ইণ্ডিয়া উইদাউট ডাট্‌টা ইজ হেল ফর মি!'

লুফৎহান্সা ফ্লাইটে চড়ে জার্মানী বা ইউরোপ ঘুরতে-ঘুরতে মিস রোডকে পাশে পেলে আলাপ করবেন। আলাপটা একটু ঘন হলে জিজ্ঞাসা করবেন চেনেন নাকি আমাদের মিঃ ডাট্‌টাকে? আপনাদের এদিকে তো বছরের অর্ধেক সময়ই থাকেন……

আমি বাজী রেখে বলতে পারি মিস রোড বলবেন, মাই গড! তুমি মা'র কাছে মাসীর গল্প করছ! মাইনে জের লিভে হের টামাল।

আমাদের পাড়ার সরলা পিসিমা বলেন, ও হতচ্ছাড়াকে তো শিবরাত্তিরের দিন পশুপতিনাথে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় আর যে-কোন মানুষ মরলে শ্মশানঘাটেও পাওয়া যায়।

এক কথায় বাঙালীর একটি পরম গর্বের বস্তু হচ্ছে তমাল দত্ত। বাংলা দেশের দ্বারদেশে তমাল দত্তকে শো-রুমে সাজিয়ে রাখলেও নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না।

আমার পোড়া কপাল বাংলাদেশে জন্মে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েও একটি বারের জন্য প্রভুর দর্শন পাইনি। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে দু-একবার কানের পাশ দিয়ে বন্দুকের গুলি চলে যাবার মতো একটুকুর জন্য তমাল দত্তের সঙ্গে দেখা হয়নি। এইতো সেবার বার্লিনে গিয়ে পৌঁছলাম বিকেলের দিকে। সন্ধ্যায় কেম্পিনিস্কি হোটেলের বারে বসে দু'-চারজন পরিচিত-অপরিচিতের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময় শুনলাম, লাঞ্চের পর প্যান এ্যামেরিকান ফ্লাইটে ফ্রাঙ্কফার্ট হয়ে নিউইয়র্ক চলে গেছেন। মিসফরচুন নেভার কামস অ্যালোন।

লণ্ডনেও ঠিক এমনি এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। হতাশায় বেদনায় বহুসময় দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত এবং প্রায় অন্যমনস্কভাবে হাই তুলে তুড়ি দিতে-দিতে বলতাম, সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।

একদিন ছিল যখন আমি এমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতাম। আজ আর আমার সে-দুঃখ নেই। উপরওয়ালা আমার মনের কান্না নিশ্চয়ই শুনেছিলেন তা নয়তো অমনভাবে তমাল দত্তের সঙ্গে জেনেভা এয়ার-পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে দেখা হয়!

·····এক বন্ধু দর্শনের জন্য মস্কো থেকে সোজাসুজি লণ্ডন না গিয়ে জেনেভা হয়ে যাবার ঠিক করেছিলাম। হাতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় ছিল। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আধঘণ্টা—পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই আবার এয়ারপোর্টে ফিরে এলাম। ব্রিটিশ ইউরোপীয়ান এয়ারওয়েজের কাউণ্টারে টিকিট দেখিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে যখন ট্রানজিট লাউঞ্জে ঢুকলাম তখনও বেশ সময় আছে। এতোটা আগে না এলেই হতো কিন্তু ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে নানা দেশের বিভিন্নমুখী যাত্রীদের আমার বেশ লাগে বলেই হাতে একটু সময় নিয়ে এসেছিলাম। পাঁচ-দশ মিনিট স্যুভেনির সপে দাঁড়িয়ে সুইস হস্তশিল্পের নিদর্শন দেখার পর এক কোণায় এক কাপ কফি নিয়ে বসে-বসে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম চারদিকে। দু'একজন ভারতীয় নারী-পুরুষকেও দেখেছিলাম কিন্তু সেখানে দৃষ্টিটাকে আটকে রাখার আকর্ষণ বা প্রয়োজন বোধ করিনি। কফির পেয়ালা শেষ করে একটা সিগারেটের আধা-আধি শেষ করতে না করতেই কানে ভেসে এলো···প্যাসেঞ্জার্স ট্রাভেলিং টু লণ্ডন বাই বি-ই-এ ফ্লাইট ফোর জিরো ওয়ান আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসিড টু গেট নাম্বার সিক্স। পৃথিবীর নানান দেশের একদল যাত্রী ছ'নম্বর গেটের কাছে জমায়েত হলেন। গ্রাউণ্ড হোস্টেস প্রতিটি যাত্রীর কাছ থেকে বোর্ডিং কার্ড ফেরৎ নিয়ে প্যাসেঞ্জার লিস্টে একটা চিহ্ন দিয়ে দিলেন। গেটের বাইরে বাসের সামনে যখন অপেক্ষা করছিলাম, গ্রাউণ্ড হোস্টেস আমাদের অপেক্ষা করতে বলে কোথায় যেন অদৃশ্য

হয়ে গেলেন। মিনিট খানেক বাদেই মাইক্রোফোনে শুনতে পেলাম··· লণ্ডন-বাউণ্ড প্যাসেঞ্জার মিঃ টামাল ডাট্টা! আপনি তাড়াতাড়ি ছ'নম্বর গেটে আসুন। তিনবার এই একই ঘোষণা মাইক্রোফোনে প্রচার করা হয়েছিল কিন্তু তমাল দত্ত আমার সঙ্গে একই প্লেনে লণ্ডন যাবেন শুনে উত্তেজনায় আমি প্রথমবারের ঘোষণা ছাড়া, পরের দুটি ঘোষণা শুনতে পাইনি। আগ্রহে উত্তেজনায় আমি ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে চেয়ে রইলাম। দু'এক মিনিট পরই একজন সুদর্শনা পশ্চিমী এসে যে কৃষ্ণকায় ভদ্রলোকটিকে ছ'নম্বর গেটের সামনে বিদায় জানিয়ে গেলেন তিনিই যে আমাদের পরম গৌরব তমাল দত্ত, সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। প্লেনে চড়বার সময় অনেক সহযাত্রীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে আমি শেষ পর্যন্ত মিঃ দত্তর পাশে আসন নিলাম। ভেবেছিলাম আমিই আগে আলাপ করব কিন্তু তা আর হলো না। হাতের ব্রীফ কেসটা সীটের নিচে রেখে কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মিঃ দত্ত বললেন, 'মনে হচ্ছে আপনি ইণ্ডিয়ান···'

'শুধু ইণ্ডিয়ান নই, বাঙালীও।'

মিঃ দত্ত বললেন, 'জানেন মশাই গড ইজ ভেরী কাইণ্ড টু মী। যখন যেখানে যেটি চেয়েছি একবার ছাড়া ভগবান আমাকে কোনদিন ব্যর্থ করেননি। ক'দিন জেনেভায় বেশ হৈ চৈ করে কাটাবার পর কেমন করে একলা-একলা চুপচাপ একটা ঘণ্টা প্লেনে কাটাব তাই ভাবছিলাম। উপরওয়ালা ঠিক জুটিয়ে দিলেন আপনাকে।'

মনে-মনে আমিও উপরওয়ালাকে স্মরণ করছিলাম, তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম এমন একটি পরম-পুরুষ মহাপুরুষের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার আশ্চর্য সুযোগ দেবার জন্য।

প্লেন কিছুক্ষণের মধ্যে তীরবেগে উপরে উঠে গেল। কোমর থেকে বেল্ট খুলে দুজনে সিগারেট ধরালাম। সিগারেটে প্রথম সুখটান মেরে মিঃ দত্ত প্রশ্ন করলেন, 'বিয়ে করেছেন স্যার?'

—না।

—করবেন নাকি?

—করব না বলে তো ভাবিনি এখনও।

—এই মেরেছে। আপনার মতলব তো সুবিধে মনে হচ্ছে না। আমার কানের কাছে মুখটা এনে মিঃ দত্ত ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমে পড়েছেন নাকি?'

আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম, 'ইচ্ছা তো করে কিন্তু পেলাম কোথায়?'

এয়ার হোস্টেস কফি দিয়ে গেল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মিঃ দত্ত বললেন, 'মেয়েদের ব্যাপারে আমার চাইতে অভিজ্ঞ লোক বাংলা-দেশে অন্তত নেই। তাই বলছিলাম স্যার, ওসব ঝামেলায় আর জড়াবেন না!'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'কেন বলুন তো?'

—কেন আবার? প্রেম করলে বিয়ে হবে না, বিয়ে করলে প্রেম হবে না বলে।

আমি কোন কথা বললাম না, শুধু একটু মুচকি হেসে জানালা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে তাকালাম।

মিঃ দত্ত বললেন, 'হাসালেন স্যার! এটা আমার কথা নয়; ফ্রাঙ্কলিন বলে গেছেন—'Where there's marriage without love, there will be love without marriage'".

মিঃ দত্তের কথায়-বার্তায় আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ইংলিশ চ্যানেল পার হবার আগেই আমাদের পরিচয় গভীর হয়েছিল ওর হৃদয়-মাধুর্যে। লণ্ডনে গিয়ে আলাদা হোটেলে থাকবার অনুমতি দিলেন না আমাকে। প্রথমে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম কিন্তু মিঃ দত্ত কোন ওজর আপত্তি শুনলেন না। বললেন, 'স্যার! জানেনই তো লাইফ ইজ বাট এ্যান ওয়ার্কিং স্যাডো। সুতরাং যে ক'দিন আছি একটু আনন্দ করতে দিন না! বাধা দিচ্ছেন কেন?'

মিঃ দত্তের আতিথ্যে অল্ডউইচের ধারে হোটেল ওয়ালডর্ফেই উঠলাম। দুটি সপ্তাহ শুধু একসঙ্গেই ছিলাম না, তমাল দত্তের মনের গ্রন্থির সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। পার্বত্য নদীর মতো

উচ্ছল আনন্দময় যে তমাল দত্তকে দুনিয়ার সবাই জানেন, চেনেন, ভালবাসেন, যে তমাল দত্তকে আমি ঠিক দেখতে পাইনি। তমাল দত্তের চোখে জল দেখিনি কিন্তু মনের কান্না শুনতে পেয়েছিলাম। হাসি-খুশী ভরা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে হয়তো অনেকে ডুব দেবার প্রয়োজন বা তাগিদ বোধ করেননি। কিন্তু তমাল দত্তের অতি উচ্ছলতা দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল তাঁর মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষত আছে; আর সেই ক্ষতটাকে ঢেকে রাখবার জন্যই তাঁর সমস্ত উচ্ছলতা।

দু'চার দিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার পরই আমি বেশ বুঝতে পারলাম কোন্ সুদূর অতীতে উনি কোথায় যেন একটা হোঁচট খেয়েছিলেন এবং সেদিনের সে-দুঃখ সে-আঘাতকে ভোলবার জন্য আজ গেলাস-গেলাস হুইস্কী খান, অসংখ্য মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেন, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হো হো করে হেসে ওঠেন।

সুযোগ আসতে খুব বেশী দেরী হলো না। আমি জানতাম উইকএণ্ডে মিঃ দত্তের অনেকগুলো ইনভিটেশন ছিল কিন্তু তবুও শুক্রবার রাত্তিরে হোটেলে ফিরে ওকে এক বোতল হোয়াইট হর্স নিয়ে বসে থাকতে দেখে আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে করতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার দত্তসাহেব? শুক্রবারের বারবেলায় সখীদের কাঁদিয়ে একলা-একলা একি করছেন!'

—জানেন স্যার, পেশাদার অভিনেতারাও অভিনয় করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একটা সময় আসে যখন তাঁরাও অভিনয় ছেড়ে ঘর-সংসারী হন। কিন্তু আমার জীবনে সে সুযোগটাও তো আসবে না, তাইতো মাঝে-মাঝে একটু একলা থাকি।

সামনের বোতলটা হাতে নিয়ে বললেন, 'একলা একলা এই হোয়াইট হর্সে চেপে ঘুরে বেড়াই। আর কি করব বলুন?'

কথাটার ঠিক মর্ম বুঝলাম না। মিঃ দত্তের মুখোমুখি হয়ে সেণ্টার টেবিলের ওপাশে বসে বললাম, 'কেমন যেন রোমাণ্টিক হয়ে গেছেন

বলে মনে হচ্ছে।'

গেলাসে আরো খানিকটা হুইস্কী ঢালতে-ঢালতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গগন হরকরার নাম শুনেছেন ?'

লণ্ডনের ওয়ালডর্ফ হোটেলের রুম নম্বর থ্রি-ফাইভ-ফোরে বসে হঠাৎ গগন হরকরাকে মনে করা সহজ হয়নি। মিঃ দত্ত খালি গেলাসে একটু হুইস্কী ঢেলে বললেন, 'একটু তাজা হয়ে নিন।' সত্যি একচুমুক হুইস্কী-সোডা খেয়ে মনে পড়ল গগন হরকরার কথা। বললাম, 'আপনি সেই গগন হরকরার কথা বলছেন যে লিখেছে আমি কোথায় পাব তারে ?'

'ঠিক ধরেছেন স্যার।'

একটু থেমে এক ঢোক হুইস্কী খেলেন, একটা টান দিলেন হাতের সিগারেটে।...জানেন স্যার আজ রোমান্টিক বলে ঠাট্টা করতে পারেন কিন্তু একদিন সত্যিই আমি রোমান্টিক ছিলাম। আজও সেই রোমান্সের আগুনে তিলে-তিলে পুড়ে মরছি। গগন হরকরার ভাষায় কি বলতে ইচ্ছে করে জানেন ?

'কি ?'

বলতে ইচ্ছে করে—"আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে। মরি হায় হায় রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে
ওরে দেখ না তোরা হৃদয় চিরে।"

সেই উইক-এণ্ডের শুক্রবার রাত্তিরে তমাল দত্তের অতীত জীবনের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের ইতিহাস মিঃ দত্ত নিজেই আমাকে শুনিয়ে ছিলেন।

...আমাদের বালী গ্রামের গোঁসাইপাড়ায় হারাধন বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতেই এক কালে আমার সারাদিন কেটেছে। স্কুল-কলেজ পালিয়েও বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর আড্ডাখানায় বা বাঁড়ুজ্যে মাসিমার রান্না-ঘরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়েছি। গঙ্গায় নতুন ইলিশ উঠলে মাকে বলতাম না, বলতাম বাঁড়ুজ্যে মাসিমাকে—মাসিমা, কাল

নতুন ইলিশ দিয়ে ভাত খাব। মাসিমা বলতেন, 'খাবি কিরে? আজই তোর জন্যে ইলিশ আনিয়েছি।' ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার দু'মাস আগে টাইফয়েড় হলে মা ছাড়া আর যাঁরা রাত জেগেছেন, মানত করেছেন সে হচ্ছে বাঁড়ুজ্যে মাসিমা আর সুলতা। মা তো মাঝে-মাঝেই অভিমান করে মাসিমাকে বলতেন, ছেলেটাকে আমি পেটে ধরেছি কিন্তু ছেলেটা তোরই।

যাই হোক, বয়স একটু বাড়লে হঠাৎ খেয়াল হলো সুলতাকে ভালবেসেছি। একদিন মেসোমশাই দোকানে যাবার পর মাসিমা চলে গেলেন কল্যাণেশ্বরতলায় পূজা দিতে। সুলতাকে ডেকে বললাম, লতা শুনে যা। সুলতা কাছে এলে বললাম, তোর হাতটা দেতো। লতা হাত বাড়িয়ে দিলে নিজের হাতের মধ্যে ওর হাতটা চেপে ধরে বললাম, লতা, একটা কথা বলব?

'বল না খোকনদা।'

'তুই রাগ করবি না?'

'তুমি পাগল হয়েছ! তোমার কথায় রাগ করব?'

অনেক দিনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে যুবক দত্তসাহেব সেদিন লতাকে বলেছিলেন, লতা, তুই আমাকে বিয়ে করবি?

দত্তসাহেব লক্ষ্য করেনি এক মুহূর্তে লতার মুখের চেহারাটায় আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন হয়েছিল; দত্তসাহেব সেদিন খেয়াল করেননি, লতা ঠোঁট কামড়ে অবাক হয়ে তার খোকনদার দিকে চেয়ে ছিল। নিরুত্তর লতাকে আর একবার হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে উত্তর দিচ্ছিস না যে?

লতা সেদিন শুধু হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। দত্তসাহেব ভেবে ছিলেন লজ্জায় লতা উত্তর দিতে পারেনি, পরে দেবে। দিনকতক পরে আর একবার লতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে লতা, সেদিন যা জিজ্ঞেস করলাম, তার তো কোন জবাব দিলি না।

'কি উত্তর দেব খোকনদা?'

আর একটু চাপ দেবার পর লতা বলেছিল, 'তা হয় না খোকনদা !'

ছাত্রজীবনে খুব ভাল ছেলে না হলেও ফেল করার মতো ছাত্র ছিলেন না দত্তসাহেব কিন্তু তবুও তিনি বি-এ পরীক্ষায় ফেল করলেন। পরীক্ষায় ফেল করার অজুহাতে দত্তসাহেব বাঁড়ুজ্যে বাড়ী যাওয়া বন্ধ করলেন। ছোটবেলা থেকে অনায়াসে যে খোকনদাকে লতা পেয়ে এসেছে, তাঁর মূল্য সে আগে উপলব্ধি করতে পারেনি।

যখন উপলব্ধি করল, কি যেন সে হারিয়েছে, কোথায় যেন তার ছন্দ-পতন ঘটেছে, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার কোথায় যেন কিসের অভাব হচ্ছে, তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। আশীর্বাদ হবার দিন একবার নয়, বার-বার মনে হয়েছিল খোকনদার কাছে ছুটে পালায়, কিন্তু দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভয়, সংস্কার লতাকে টেনে রেখেছিল। শ্রীরামপুরের অনাথ চক্রবর্তীর গলায় মালা পরাবার আগে একবার বিদ্রোহ করবার ইচ্ছা হয়েছিল লতার, কিন্তু পারেনি।

ছোটবেলা থেকে মনের দোসর হওয়া সত্ত্বেও সেদিনের অনভিজ্ঞ যুবক খোকনদা তাঁর লতার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা জানতে পারেনি। তাইতো সে লতার অবজ্ঞাকে সহ্য করতে পারেনি, বালীগ্রাম ত্যাগ করে পৃথিবীর জনারণ্যে সে নিজেকে মিশিয়ে দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল।

সেদিনের বালীগ্রামের প্রায় অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যর্থ-প্রেমিক যুবক তমাল দত্ত প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে আগামী দিনের দিকে এগিয়ে যাবার পথে প্রতি পদক্ষেপে সার্থক হয়েছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ফার্ম খুলেছেন, হয়ত কোটি টাকাই রোজগার করেছেন। একদিন একটি নারীর কাছে অবজ্ঞা পেলেও পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ-প্রতিপত্তির সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে অনেক, অনেক নারী এসেছে তাঁর জীবনে। অদৃষ্টের চাকা আরো অনেকখানি ঘুরেছিল।

তাইতো একদিন লতাও এসে হাজির হয়েছিল রাসেল স্ট্রীটে তমাল দত্তের অফিসে। কাজের ভীড়ে, ফাইল পত্তরের চাপে ভিজিটার্স দেখার যখন সময় হলো তখন প্রায় পৌণে-পাঁচটা বাজে। লতাকে

চেম্বারে ঢুকতে দেখে মিঃ দত্ত চমকে গিয়েছিলেন। প্রথম দু-চার মিনিট দু'জনের কেউই কথা বলতে পারেনি। নির্বাক দুটি মানুষ সেদিন অস্তগামী সূর্যের করুণ রশ্মির মুখোমুখি হয়ে বহু দূরে ফেলে আসা অতীত স্মৃতির মধ্যে ডুব দিয়েছিল। লতা চোখের জলের বন্যা বইয়েছিল, নিজের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের গোপন ইতিহাসের খুঁটিনাটিও বলেছিল তার খোকনদাকে। আর শুনিয়েছিল তার ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের করুণ ইতিহাস।

মিঃ দত্ত চোখের জল ফেলেনি, কিন্তু পাতা দুটো ভিজে উঠেছিল। বেশী কথা বলতে পারেনি। লতার হাতে পাঁচ হাজার টাকা গুঁজে দিয়ে শুধু বলেছিলেন, লতা, ভুলে যেও না একদিন তোমাকে ভালবাসতাম হয়তো আজও ভালবাসি। তোমার চোখের জল দেখলে আজও আমার পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয়। হয়তো তোমারই কথা ভেবে নিজের জীবনে আর কোন মেয়েকে ঠাঁই দিতে পারলাম না। একটা মোটা ভারী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, যাক্ সেসব কথা। তুমি যে তোমার খোকনদাকে ভোলনি, সেজন্য ধন্যবাদ, আর ভবিষ্যতে যদি মনে কর তবে মনে করব অনেক ব্যর্থতার মধ্যেও কিছুটা সার্থকতা পেলাম।

ওয়ালডর্ফ হোটেলে বসে বসে বহু আলোচিত এই মানুষটির জীবন-কাহিনী শুনতে-শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আর একটা নতুন বোতলের ছিপি খুলতে-খুলতে মিঃ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা স্যার, এত মদ খাই, এত মেয়েকে নিয়ে খেলা করি কিন্তু তবুও কেন লতাকে ভুলতে পারি না বলতে পারেন? বলতে পারেন অনেক স্মৃতির তলা থেকে ঐ স্মৃতিটাই বারবার কেন উঁকি দেয়?'

প্রেম শাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া তমাল দত্তের জীবন-কাহিনী শুনে নিজের মনের মধ্যেও যেন একটা নাড়া খেয়েছিলাম। শুধু বললাম, 'কেউটে সাপের বিষের জ্বালা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে, কিন্তু এ-বিষের জ্বালা তো কোনদিন যায় না।'

দুদিন পরে মিঃ দত্ত নিউইয়র্ক রওনা হলেন। আমিও ঐদিনই

দিল্লীর পথে রোম রওনা হলাম। আমার প্লেন দেরীতে ছাড়লেও দত্তসাহেবকে বিদায় জানাবার জন্য একই সঙ্গে এয়ারপোর্ট এলাম। দুজনেই লগেজ চেক আপ করে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে ট্রানজিট লাউঞ্জে ঢুকলাম। দু'বোতল বিয়ার নিয়ে দুজনে এক কোণায় বসলাম। মিঃ দত্ত একটু হাসলেন, তলিয়ে গেলেন অতীত স্মৃতির ভীড়ে। আর এক সিপ বিয়ার খেয়ে বললেন, 'জানেন স্যার, এই ট্রানজিট লাউঞ্জ আমার বড় ভাল লাগে। কত বিচিত্র দেশের বিচিত্রতর মানুষ এখানে কিছু সময়ের জন্য আসছেন। কেউ এক পেগ হুইস্কি, কেউ এক গেলাস বিয়ার, কেউ বা এক কাপ চা বা কফি নিয়ে বসে থাকেন। কেউ হাসছেন, কেউ ভাবছেন, কেউ বা হয়তো আমারই মতো কোন জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরছেন। কেউ হয়তো বিয়ে করতে যাবার আনন্দে প্লেন ধরার জন্য এখানে অপেক্ষা করেন, আবার কেউ হয়তো প্রিয়তম মানুষের ফিউনা-রেলে যোগ দেবার জন্য প্লেনের পথ চেয়ে বসে থাকেন।'

মিঃ দত্ত চোখ দুটোকে সরিয়ে নিলেন, দৃষ্টিটা লম্বা রাণওয়ে ছাড়িয়ে আরো অনেক-অনেক দূরে নিয়ে গেলেন। তারপর একটু নরম গলায় ভেজা ভেজা স্বরে বললেন, 'এই দুনিয়াটাও তো একটা বড় ধরনের ট্রানজিট লাউঞ্জ। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে ; কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। কারুর প্লেন পনেরো মিনিট পরে, আবার কারুর প্লেন দু'চার ঘণ্টা পরে। তবে যাবে সবাই, থাকবে না কেউ। তাইতো ভাবি, আমিও একদিন চলে যাব, চলে যাবে লতা। হয়তো আমার প্লেন আগে, লতার প্লেন পরে। কিন্তু সব যাত্রীকেই তো একদিন একটা জায়গায় মিলতে হবে·····

মাইক্রোফোনে হঠাৎ ঘোষণা শোনা গেল, প্যাসেঞ্জার্স ট্রাভেলিং টু নিউইয়র্ক বাই এয়ার ইণ্ডিয়া ফ্লাইট ওয়ান জিরো থ্রি আর রিকোয়েস্টেড টু প্রসিড টু···

মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। আমার হাতে হাত দিয়ে বললেন, 'চলি স্যার! হয়তো আবার কোনদিন এমনি ট্রানজিট লাউঞ্জে দেখা হবে! গুড বাই!'

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। যখন হুঁস হলো তখন দেখি এয়ার ইণ্ডিয়া বোয়িং আকাশে উড়ে গেছে।

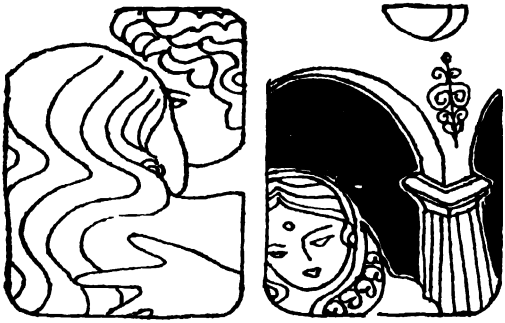

সতী সাধ্বী নারীর জীবনে সিঁথির সিন্দুর সব চাইতে গর্বের ধন; রাজধানীর সামাজিক জীবনে ফ্রেণ্ডস কলোনীতে বাস করা তার চাইতে অনেক বেশী গর্বের, অনেক বেশী সম্ভ্রমের। ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভের ছেলেমেয়েরা অশোকা হোটেলে সাঁতার কাটতে যায়, জিমখানা ক্লাবে টেনিস খেলে, কিন্তু ফ্রেণ্ডস কলোনীর ছেলেমেয়েদের এত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয় না। সামনের লনের বাঁ দিকে টেনিস কোর্ট, ভিতরের লনের ডান দিকে সুইমিং পুল অনেক বাড়ীতেই পাওয়া যাবে। সারা ফ্রেণ্ডস কলোনীতে একটিও দোতলা বাড়ী নেই, কিন্তু কোন বাড়ীর দক্ষিণাই হাজার চারেকের নীচে নেই বললেই চলে। বাংলা সরকারের হেড্ এ্যাসিস্ট্যাণ্টের চাইতে এখানকার বাবুর্চির মাইনে বেশী, ডেপুটি সেক্রেটারীর চাইতে ভাল পোষাক পরে, অনেক ভাগ্যবান সেক্রেটারীর চাইতে বেশী দেশ ঘুরছে।

ফ্রেণ্ডস কলোনীর বাসিন্দাদের নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতায় পাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে আইন-আদালতের কলমে বা কোম্পানীর নোটিশের মধ্যে পাওয়া যায়। এরা অনেকেই মন্ত্রীদের বক্তৃতা পড়েন না, কিন্তু ফিনান্স মিনিষ্ট্রী বা উদ্যোগ ভবনের আণ্ডার সেক্রেটারীদের জন্মদিন পালন করেন লুকিয়ে-লুকিয়ে।

রাজধানী দিল্লীতে যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তীর্থক্ষেত্র ছিল তখন গলফ্ লিঙ্ক—জোড়বাগ—ডিফেন্স কলোনী—ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ বা ফ্রেণ্ডস কলোনীর জন্ম হয়নি, তিন-চার কি পাঁচ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দেবার প্রশ্ন ওঠেনি। দেশের হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে, সোস্যালিজমের ঝড় ওঠবার পর ডিপ্লোম্যাটিক এনক্লেভ—ফ্রেণ্ডস কলোনীর সৃষ্টি হলো, হাজার-হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দেবার খদ্দেরেরও অভাব ঘুচল।

দিল্লীর সমাজ-জীবনের এ হেন ফ্রেণ্ডস কলোনীতে মিঃ কাপুরও বাস করতেন। যাঁরা দূর থেকে তাঁকে দেখেছেন, দেখেছেন ফ্রেণ্ডস কলোনীর জীবনকে, তাঁরা জানেন, বিশ্বাস করেন কাপুর সাহেবের জীবনে শুধু আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। দিল্লীর মানুষ বিশ্বাস করে না ফ্রেণ্ডস কলোনীর জীবনে কোন দুঃখ, কোন হতাশা, কোন দীর্ঘ নিঃশ্বাস থাকতে পারে।

কিন্তু ফ্রেণ্ডস কলোনীর কাপুর সাহেব জীবনের শেষ দিনগুলিতে চোখের জলের বন্যা বইয়েছেন, বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা উপলব্ধি করেছেন। শুধু কি তাই? মানুষ দেখলে ভয় পেয়েছেন, সুন্দরী যুবতী দেখলে শিউরে উঠেছেন, মদের গেলাস দেখলে ছুটে পালিয়েছেন। রাত্রিতে ঘুমিয়েও শান্তি পাননি কাপুর সাহেব। ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়েছে অতীত দিনের স্মৃতি। তিরিশ্ বছরের অতীত স্মৃতির জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করে ঘরে এসেছেন রায়বাড়ীর ছোট-বৌ·····

···বিলেত থেকে ফেরার পর আমাকে বর্ধমান, চট্টগ্রাম, বরিশাল ঘুরিয়ে প্রথম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চার্জ দিল খুলনায়। আজকের মতো তখনকার দিনে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের অত ঝামেলা পোহাতে হতো না। আইন-শৃঙ্খলা করাই ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। খুলনায় এসব ঝামেলা একটু কমই ছিল এবং প্রথম কয়েকটা মাস ভালই কাটল। কিন্তু তারপর এক অতি বর্ধিষ্ণু গ্রামে পর পর দুটি খুন হওয়ায় পরিস্থিতি বেশ একটু জটিল হলো। গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তে মনে হলো স্বদেশীওয়ালাদের কাজ নয়। সরকার ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না।

আমার উপর আদেশ হলো একটু ব্যক্তিগত নজর রাখতে। ক'মাস আরো কেটে গেল।

এরপর একদিন নিমন্ত্রণ এলো ঐ গ্রামের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করতে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ঠিক করলাম ঐ গ্রামে কয়েক দিন থাকব, কিন্তু কাউকে জানালাম না।

যথারীতি অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের মতো আমারও থাকার ব্যবস্থা হলো রায়বাড়ী। মহাসমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করা হলো। কয়েক হাজার গ্রামবাসীর সামনে রায়বাড়ীর তিন বাবু ও তিন গিন্নী আমাকে নতুন জামাই-এর চাইতেও অনেক বেশী সমারোহে বরণ করলেন। ছোটবাবু বেশ সৌখীন মানুষ; সন্ধ্যার পর একটু নাচ-গানেরও আয়োজন করেছিলেন।

পরের দিন সকালে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করলাম। সভার শেষে স্কুলের জন্য সরকারী তহবিল থেকে পাঁচ হাজার টাকা দান করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় গ্রামের আপামর সাধারণ আমার মহানুভবতায় মুগ্ধ হলো।

বিকেলবেলায় গ্রাম দেখতে বেরুলাম। সবাই ভেবেছিলেন সন্ধ্যার আগেই আমি শহরের দিকে রওনা হবো। কিন্তু বেড়িয়ে এসে জানালাম, গ্রামটাকে ভালবেসে ফেলেছি। ক'দিন থেকে যাব। রায়বাবুদের বললাম, তা'ছাড়া পর পর দুটি দারোগা খুন হওয়ায় গ্রামের লোকের মনে একটু আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, সুতরাং আমি থাকলে হয়তো তাদের আস্থা ফিরে আসবে।

মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। মনে হলো ছোটবাবু ও ছোট গিন্নীর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। কিন্তু মুখে অবশ্য সবাই অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

কাপুর সাহেব তাঁর অতীত জীবনের কথা বলতে গিয়ে একটু পায়চারী করে নিলেন। একটু হাসলেন, একটু ভাবলেন, একটু যেন তলিয়ে গেলেন।...

'জানো জার্নালিষ্ট, ছোটবাবু জমিদারীর জরুরী কাজে গ্রামান্তরে গেলেন সে রাত্রে। যাবার সময় ছোট-বৌকে বিশেষ করে অনুরোধ করে গেলেন আমার দেখাশুনা করতে।'

একটু পরেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। গ্রামের দু'চারজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কাপুর সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে বিদায় নিলেন।

ছোট-বৌ নিজে তদারক করে কাপুর সাহেবকে ডিনার খাইয়ে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমি ঐ বারান্দার কোণার ঘরে থাকব। যদি কোন দরকার হয়, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ডাকবেন।'

—না না কিছু দরকার হবে না, আপনি এবার বিশ্রাম নিতে যান।

'হাসিমুখে হাত জোড় করে নমস্কার করে ছোট-বৌ বিদায় নিলেন। বারান্দার ঝাড় লণ্ঠনগুলো নিবিয়ে দিয়ে চাকর-বাকরের দলও বিদায় নিলো। আরো কিছুক্ষণের মধ্যে সারা জমিদার বাড়ীই নিঝুম হয়ে পড়ল। সারা দিনের অসংখ্য মানুষের কলকোলাহল রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে হারিয়ে গেল।'

টিপটিপ বৃষ্টি আর জলো-হাওয়ার বেশ একটু ঠাণ্ডা আমেজ ছিল সে রাত্রে। ঘুমটা বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠলেন কাপুর সাহেব। সারা আকাশ ভরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। পায়ের দিকের জানলা দিয়ে একঝলক আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে।

কাপুর সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন, প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? আপনি?'

সে রাত্রের প্রতি মুহূর্তের কাহিনী শোনার নয়, শোনাবারও নয়। প্রখ্যাত জমিদার রায়বাড়ীর ছোট-বৌ সেদিন সে রাত্রে ধীরে ধীরে কিভাবে তাঁর দেহের, মনের, সংস্কারের, ঐতিহ্যের বন্ধন খুলে দিয়েছিলেন, সে কাহিনীর পূর্ণ বৃত্তান্ত আজও বলতে গেলে কাপুর সাহেবের গলা শুকিয়ে আসে, চোখ-মুখ-কান লাল হয়ে ওঠে।

আমার দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলেন কাপুর সাহেব। ছোট টিবেটিয়ান কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন. 'জার্নালিষ্ট, তুমি আমার ছেলের বয়সী, মুশকিল সেইখানে...'

কয়েক মুহূর্তের জন্য আবার একটু তলিয়ে গেলেন কাপুর সাহেব।

'...ধীরে ধীরে তিলে তিলে একটু ছোঁয়া, একটু হাসি, একটু আদর, একটু ভালবাসার খেলা খেলে ছোট-বৌ আমাকে গ্রাস করল। আমার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, আমার বিদ্যা-বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান বিদায় নিল।

ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে নিজের বিছানায় ছোট-বৌকে দেখে চমকে উঠলেন কাপুর সাহেব। ছোট-বৌ কিন্তু চমকে ওঠেনি।

...'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, এ বাড়ীর কর্তারা নিজের বাড়ীতে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ভালবাসার অভিনয় করেন কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার হতে না হতেই খাঁচা ছেড়ে উড়ে যায়!' একটু মুচকি হেসে বলেছিল, 'কিন্তু এ বাড়ীর গিন্নীরাও সন্ন্যাসিনী নয়।'

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া করেই শহরে যাবার পরিকল্পনা ছিল কাপুর সাহেবের, কিন্তু সুরমা-মাখা বাঁকা চোখের হাসি দিয়ে ছোট-বৌ তাঁর সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছিলেন। আরো ক'টি রাত্রি রায়বাড়ীর অতিথিশালায় ছিলেন তিনি। রাত্রির অন্ধকারে দেহের, মনের সমস্ত বন্ধন যখন শিথিল হয়েছিল, তেমনি এক দুর্বল মুহূর্তে ছোট-বৌ বলেছিলেন, 'রাত্রের অন্ধকারে যখন আমরা শিকারের খোঁজে বেরিয়ে থাকি, তখন কোন বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করা সম্ভব হয় না। রায়বাড়ীর বাবু বা গিন্নীদের হাতে দু'চারজন ভাগ্যবান প্রজার স্বর্গবাস হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।'

কাপুর সাহেব এ-কথার তাৎপর্য বুঝেছিলেন; বুঝেছিলেন ইদানীংকালের দুটি খুনের রহস্য। দুর্বলতাবোধ করেছিলেন রহস্য উদ্ধারের কাজে এগুতে।

সেই হলো শুরু।

পরবর্তী কালে কর্মব্যপদেশে প্রায় সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছেন কাপুর সাহেব। অর্থ, প্রতিপত্তি, মর্যাদার জন্য কাঙাল হয়ে কত অসংখ্য মানুষ এসেছেন তাঁর কাছে। একটা লাইসেন্স, পারমিট, বে-আইনী কাজ করে অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষকে অমানুষ হতে

দেখেছেন তিনি। প্রথম প্রথম বিবেক বিদ্রোহ করেছে, মন সায় দেয়নি। ছোট-বৌ-এর স্মৃতিকে নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা বলে মনে করেছিলেন কাপুর সাহেব। সে স্মৃতি তিনি মুছে ফেলেছিলেন মন থেকে। নিষ্ঠাবান স্বামীরূপে, স্নেহশীল ও দায়িত্বশীল পিতারূপে তিনি সারা সংসারের প্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে, তিলে তিলে অদৃশ্য ক্ষয়রোগের মতো সমাজের মানুষ তাঁর সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সারা সংসারে। স্ত্রীর ভালবাসা, পুত্রের শ্রদ্ধা হারিয়েছেন তিনি।

কাপুর সাহেব বারান্দা থেকে লনে নেমে একটু পায়চারী করে গোটাকতক ক্রিসানথিমাম্ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন মাটিতে।

…'তুমি ভাবতে পারবে না জার্নালিষ্ট, মানুষ অর্থের জন্য, নারীর জন্য কত নীচ, কত জঘন্য, কত অশ্লীল হতে পারে।…ইন্স্পেক্শনের জন্য বেরিয়ে ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়েছি, বিশ্রাম নেবার জন্য ফরেস্টে গিয়েছি, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বন্ধুর বাড়ী গিয়েছি, সব জায়গায় ব্যবসাদারের দল আমার জন্য একটি নৈবেদ্য প্রস্তুত রেখেছে। মন বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু দেহকে সংযত করতে পারিনি। রাগে-আক্রোশে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এইরকম আগুন নিয়ে খেলা খেলতে খেলতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আর হারালাম নিজের সংসার। আমার স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে বিদায় নিলেন আমার সংসার থেকে। সে আজ বিশ বছরের কথা। এই বিশ বছরে আমি যতটা তলিয়ে গেছি, যতটা নীচে নেমেছি, আমার পুত্র ঠিক ততটাই উঁচুতে উঠেছে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে সে আজ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে সিনিয়র লেকচারার, কিন্তু তাকে নিয়ে আমার গর্ব করার কোন অধিকার নেই।'

কাপুর সাহেব গড় গড় করে আরো অনেক কথা বলেছিলেন। আমি থামাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

…'অনেক জায়গা ঘুরে শেষে দিল্লীতে এসে ভেবেছিলাম একটু স্বস্তি পাব, নিজেকে রক্ষা করতে পারব। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ ; ভারত-

বর্ষের সর্বত্র রাত্রের অন্ধকারের সুড়ঙ্গপথে সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে যে কারবার, যে লেন-দেন হয়, রাজধানী দিল্লীতেই সেই লেন-দেন প্রায় প্রকাশ্যে হবার অফুরন্ত সুযোগ।'

'লিয়াজেঁ। অফিসার আর থার্ডপার্টিদের কৃপায় লাঞ্চ-ডিনার ককটেল রিসেপশনের অভাব নেই। এদের অনেকের কৃপায় সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে জোড়বাগ-গলফ্ লিঙ্ক—ডিফেন্স কলোনী—সুন্দর নগরের অনেক ফ্ল্যাটে, বিংশ শতাব্দীর অপ্সরীদের আবির্ভাব হয়।'

কাপুর সাহেব বলতেন, পারভারশনের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে, পৈশাচিক আনন্দের মধ্যে একটা নেশার আমেজ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে আছে অর্থ। এই ত্র্যহস্পর্শের টানে নেমে এসেছে সর্বস্তরের নারী।

রাজধানী দিল্লীর নৈশ অভিযানের অন্যতম নায়ক ছিলেন আমাদের কাপুর সাহেব। কিন্তু হঠাৎ একদিন দীর্ঘদিনের ইতিহাসের মোড় ঘুরল, কাপুর সাহেবের কাহিনীর ওপর যবনিকা নেমে এলো।

পর পর তিন দিন ছুটি ছিল। ডেরাডুনে চাওলাদের অতিথিশালায় তিনটি দিন উপভোগ করার জন্য মিঃ চাওলার সঙ্গে কাপুর সাহেব ভোরবেলায় চলে গেলেন ডেরাডুন। লাঞ্চের পর বিশ্রাম করে সন্ধ্যার মুখোমুখি ফিয়েটে করে দু'জনে চলে গেলেন মুসৌরী। ডিনার খেয়ে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। চাওলা সাহেবের গাড়ী গেট দিয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই হঠাৎ লাইট ফিউজ হয়ে গেল।

কাপুর সাহেবের সন্তোষ বিনোদনের জন্য একটি নৈবেদ্যের আয়োজন করেছিলেন বুদ্ধিমান চাওলাসাহেব। গাড়ী থেকে নেমে বারান্দায় উঠতেই তিনি মিহি সুরে দু'জনকে অভ্যর্থনা করলেন। চাঁদের আবছা আলোয় চাওলাসাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন, কমলা, মীট মাই গুড এ্যাণ্ড রোমান্টিক ফ্রেণ্ড ববি কাপুর! ঐ আবছা আলোতেই তিনজনেই দু-এক পেগ হুইস্কী খেয়ে একটু গল্পগুজব করলেন।

ইতিমধ্যে চাকর-বাকরের দল ছুটাছুটি করেও একটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রী জোগাড় করতে পারল না। কাপুর সাহেব টিপ্পনী কেটে বললেন,

'দি ইলেক্‌ট্রিসিয়ান উইল নট টার্ন আপ বিফোর টু-মরো মর্নিং !'

কয়েক মিনিট বাদেই টেলিফোন বেজে উঠল। এক বন্ধু সন্দর্শনের জন্য চাওলাসাহেব বিদায় নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসার। বিশ বছর আগে হলে কাপুর সাহেব বিশ্বাস করতেন, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান এসে আলো জ্বালাবে আর চাওলাসাহেব আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন। আজ জানেন, এ-সবই মিথ্যে, সবই উপলক্ষ্য মাত্র।

লনে বসে আরো পেগ দুই হুইস্কী খেয়ে নিলেন দুজনে। তার-পরের কাহিনী নতুন কিছু নয়। বাকী রাতটুকুর জন্য কমলার বুকে আশ্রয় নিলেন কাপুর সাহেব।

ভোরবেলার দিকে ঠাণ্ডার আমেজ লাগায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমে অচৈতন্য প্রায় বিবস্ত্রা কমলাকে পাশে দেখে চমকে উঠলেন কাপুর সাহেব। খুব ভাল করে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, কপালের কাটা দাগটা ঠিকই আছে, বাঁ দিকের গালের তিলটাও। কাপুর সাহেবের সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। বিন্দু বিন্দু ঘামে সারা শরীরটা ভিজে উঠল। কমলার গলা পর্যন্ত একটা চাদর টেনে দিয়ে খুব ভাল করে সারা মুখটা দেখে নিলেন। প্রায় বছর দশেক আগে দেখেছিলেন এই মুখ, বড় পছন্দ হয়েছিল। আদর করে ঘরে তুলে এনেছিলেন এক অনুজ প্রতিমের বধূরূপে।···ভাইয়ের থেকেও বেশি, দু' যুগের ওপর তাঁরই কাছে থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই ছেলে। সংসারের বিচিত্র গতিতে আর দেখা হয়নি ! কোন সন্দেহের কারণ ছিল না, তবুও আলতো করে হাতের আংটিটা দেখলেন, ভ্যানিটি ব্যাগটা দেখে নিলেন। সব সংশয়ের অবসান।

হাতের কাছে রিভলবার থাকলে নিশ্চয়ই গর্জে উঠত। হয়তো দু'টি প্রাণই দেহছাড়া হতো। কিন্তু তা হয়নি। কাপুর সাহেব চোরের মতো লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন দিল্লী। চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ফ্রেণ্ডস কলোনীর বাড়ীতে বন্দী করেছেন নিজেকে।

মাঝে মাঝে আমি গিয়েছি। টুক্‌টাক্‌ কথাবার্তা। কিন্তু তাঁর

সংযত আচরণের মধ্যেই কেমন যেন একটা চঞ্চলতা লক্ষ্য করেছি। বড় অসহায় মনে হয়েছে কাপুর সাহেবকে। তারপর আর ক'দিন যেতে পারিনি। কাজের চাপে টেলিফোন করাও হয়নি।

সেদিন শনিবার। পার্লামেণ্ট নেই। ভেবেছিলাম একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোবো। কিন্তু ভোরবেলায় ঘুম ভাঙাল কাপুর সাহেবের চাকর রামলোচন সিং। গাড়ী নিয়ে ছুটে গেলাম। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'বাবুজী, সাহেব দাবাই পিকে গুজর গ্যায়া।'

প্রতি মানুষের জীবনেই কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। আমার জীবনেও ঘটেছে। কিন্তু এর কোন কারণ নেই, কোন যুক্তি নেই। যা হলো, তা না হলেও চলতো এবং যা ঘটল না অথচ ঘটলে ভাল হতো—এমনি অনেক কিছু দিয়েই তো মানুষের জীবন। এই সব যুক্তি-তর্ক আমি জানি, আমি বুঝি কিন্তু তবু আজও অলস মধ্যাহ্নে বা গোধূলির রাঙা আলোয় মথুরা রোড দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার পথে মনটা উদাস হয়ে যায়। ডান পাটা অ্যাকসিলারেটরের 'পর চাপ দিলেও যেন গাড়ী ছুটতে চায় না, স্টিয়ারিংটা জোর করে চেপে ধরলেও যেন মনে হয় তাতে জোর নেই। পিছনের সমস্ত গাড়ী আমাকে ওভারটেক করে আগে যায়, আমি পিছিয়ে পড়ি।

কিন্তু আমার মন? সে ইম্পালা, মার্সিডিসকে হারিয়ে দেয়।

ছ'শো-সাতশো মাইল স্পীডের বোয়িং সেভেন-জিরো সেভেনকেও হারিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আমার মন ছুটে চলে যায় কায়রোর নাইল নদীর পাড়ে, নাইল হিলটন হোটেলের চারতলার ঐ কোণার ঘরে।

আজও মাঝরাতে ঘুম ভাঙ্গলে ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠি, মনে হয় বুঝি ডাক্তারের ঘরেই শুয়ে আছি। আজও বিদেশে গেলে হোটেলের লাউঞ্জে, এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে বা এয়ার লাইন্সের কাউণ্টারে একটা বিরাট খোপাওয়ালা একটু ময়লা, একটু বেঁটে মেয়ে দেখলে আজও চমকে উঠি।

কিন্তু কেন এমন হয়? আমি তো ডাক্তারের প্রেমে পড়িনি, সেও তো আমাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের কোন স্বপ্ন দেখেছিল বলে আমি বুঝতে পারিনি। তবে? এর জবাব আমি খুজে পাইনি। মনে মনে শুধু এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি যে, মানুষের মন তো অপারেশন থিয়েটারের পেসেণ্ট নয় যে ছুরি-কাঁচি দিয়ে কাটাকুটি করলেই ব্যথা লাগে আর সেলাই করে ক'টা ইনজেক্শন দিয়ে বড়ি গিলিয়ে দিলেই সে ব্যথা সেরে যাবে।

তাই তো আজও অনেক স্মৃতির ভীড়ের মধ্যেও ডাক্তারের স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি সেই দুটি দিনের মিষ্টি ইতিহাস। আমি স্থির জানি আজও যদি কায়রো, রোম, প্যারিস বা লণ্ডনে অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক্তারের সঙ্গে আমার দেখা হয়, আনন্দে —আত্মতৃপ্তিতে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, উত্তেজনায় জড়িয়ে ধরবে। হয়তো শাড়ির আঁচলটা বুকের 'পর থেকে খসে পড়বে, চোখের কোণে একটু দুষ্টু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলবে, বাচ্চু! তুমি আজও আমাকে ভুলতে পারনি?

আমি শুধু বলব, ডাক্তার, তুমি যে আমাকে এমন করে ভুলে যাবে তা আমি কোন দিন ভাবতে পারিনি।

আমার কাছ থেকে একটু সরে শাড়ির আঁচলটা টেনে উঠিয়ে আবার ভাল করে জড়িয়ে নিতে নিতে ডাক্তার বলবে, তুমি যেন কোথাকার কোন্ রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে একদিন আমার পর্ণকুটিরে

উদয় হয়ে আমাকে ধন্য করেছিলে যে তোমাকে মনে করে রাখতে হবে!

ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানি না, নাইল হিলটন হোটেলের ঐ দুটি দিনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে ডাক্তারের জন্য আহত আমার মনটা পীড়িত হয়। জীবন সংগ্রামের কোন ব্যর্থতার বেদনায় কখনও মনটা বিষণ্ণ হলে ডাক্তারের কথা মনে পড়ে, ঐ দুটি দিনের ইতিহাস রোমন্থন করে এখনও অনেক আনন্দ, অনেক তৃপ্তি পাই।

·····মাস চারেক আগে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে পালামে অনেকেই এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। লগেজ ও টিকিট চেক করে কাস্টমস এনক্লোজারে না ঢুকে ফিরে এসেছিলাম লাউঞ্জের এক কোণায় বন্ধু-বান্ধবীদের মাঝে।

কোকাকোলার বোতল নামিয়ে রেখে বেলা গুণ গুণ করে গান শুনিয়েছিল, 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে, সেদিন ভরা সাঁঝে' গৌরী-বৌদি কানে কানে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, দেখবেন ঠাকুরপো, বেশী দুষ্টুমি করবেন না কিন্তু! আদো আদো গলায় ছল ছল চোখে বন্নুয়া মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাকে মনে থাকবে? আমি ওর মাথাটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলাম, যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম, সুতরাং তোমাকে ভুলব কি ভাবে বলতে পার?

প্রতিমা আমাকে একটা চিমটি কেটে বলল, 'ক'মিনিট বাদে এয়ার হোস্টেস দেখলেই তো সব গুলিয়ে যাবে আবার···'

আমি বললাম, 'বলেন কি? এয়ার হোস্টেস তো এমনিতে উড়ে বেড়ায়; তাঁকে নিয়ে আমি আর কি উড়ব? উড়তে হলে গ্রাউণ্ড হোস্টেস নিয়েই উড়ব।'

উকিলদার চিৎকার, ব্রহ্মচারীর মুচকি হাসি ও আরো অনেক কিছু উপভোগের পর দামাল দত্তের কমিক গান শুনিয়ে আমার বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হলো! আমি পাশপোর্ট, হেলথ সার্টিফিকেট চেক করিয়ে কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকলাম। তারপর আবার বেরিয়ে এসে বাইরে রেলিং-এর এপারে দাঁড়িয়ে সবাইকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে প্লেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েও বার বার

পিছন ফিরে দেখেছি, হাত নাড়ার উত্তর দিয়েছি। প্লেনের মধ্যে ঢোকবার আগে আর একবার রুমাল নেড়ে ওদের সবার প্রতি শেষবারের মতো শুভেচ্ছা জানালাম।

ব্যস! তারপর আর প্রাণ খুলে বাংলা কথা বলিনি, প্রাণ খুলে আড্ডাও দিইনি। লণ্ডনে একদিন সন্ধ্যায় এক বাঙালী ডাক্তারের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম, কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণেকের জন্যে। দীর্ঘ চারমাস বিদেশ ভ্রমণকালে আরো দু'চারজন বাঙালীর দেখা পেয়েছি, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

কর্মব্যপদেশে চার চারটি মাস থেকে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা বা মাঝরাতে টাইপ-রাইটারে প্রেস ম্যাসেজ টাইপ করে কেব্‌ল পাঠিয়েছি প্রায় প্রতিদিন। কাজকর্ম ও ককটেল-ডিনারের অবসরে মস্কোয় রেড স্কোয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছি, লেনিনের স্মৃতি সৌধে লেনিনের মৃতদেহ দেখেছি, জারদের স্মৃতি বিজড়িত পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্রেমলিন প্রাসাদ দেখেছি, লেনিনগ্রাদে অক্টোবর বিপ্লবের স্মৃতি চিহ্ন দেখেছি, প্যারিসে ক্রেজী হর্স সেলুনে উন্মত্ত যৌবনের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে সারারাত স্যাম্পেন খেয়েছি, বার্লিনে দুটি বিবদমান মহাশক্তিকে মুখোমুখি দেখেছি, দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার জীবন্ত ইঙ্গিত।

আরো অনেক কিছু দেখেছি ও করেছি। লণ্ডনে বণ্ড স্ট্রীট, অক্সফোর্ড স্ট্রীট, রিজেণ্ট স্ট্রীটে ঘুরে বেড়িয়েছি। রাতের লণ্ডনে ইংরেজ যুবক-যুবতীদের অসহ্য উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি 'কালা আদমী'দের দুর্গতি। তারপর রোমে সুন্দরী ইতালিয়ান যুবতীর উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করেছি, সেণ্ট পিটারের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর একবার মহাকবি কীটস্‌-এর সমাধির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। এরপর 'ক্রেডল অফ সিভিলাইজেশন আথেন্স' দেখে এলাম বেইরুট। বাইবেলের ভাষায় লেবানন 'দুধ ও মধুর দেশ' হলেও আজকাল বোধহয় ওদেশের শিশুরাও হুইস্কী খেয়ে নাইট ক্লাবে মানুষ হয়।

এলাম কায়রো। সাতদিন থাকার প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু সাত

হাজার বছরের ইতিহাসের 'পর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে সাত দিনও সময় নিলাম না, পাঁচ দিনেই মোটামুটি সব কিছু দেখে নিলাম। স্যার যদুনাথ সরকার বা টয়েনবি হলে যে কাজ সত্তর বছরেও করতে পারতেন কিনা সন্দেহ, আজকের দিনে বুদ্ধিমান টুরিস্ট সে কাজ প্রয়োজনবোধে একদিনেও শেষ করতে পারেন। তাইতো পাঁচদিন ঘোরাঘুরির পর আমি আর প্রয়োজনবোধ করলাম না।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরও অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি করে কাটালাম। তবুও উঠলাম না, মাথার বালিশ দুটোকে বুকের তলায় চেপে ধরে বিছানার 'পর পড়ে রইলাম আরো কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনটা উদাস হয়ে গেল, মনে পড়ে গেল দিল্লীর স্মৃতি। ঘরে ফেরার টান অনুভব করলাম অনেক দিন পর। আপন জনের বিরহ বেদনায় মনটা একটু নরম হয়ে গেল। মনে হলো ছুটে চলে যাই দিল্লী, কিন্তু মন তো অনেক কিছুই চায়!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতেই হলো। হেলে দুলে বাথরুমে গেলাম। সেভ করে, স্নান সেরে বেরিয়ে এসে দেখি সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। রুম সার্ভিসকে টেলিফোন করে ঘরে ব্রেকফাস্ট দিতে বললাম। ব্রেকফাস্ট সেরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ওপর দিয়ে আরেকবার ব্রাশটা টেনে নিলাম, নাকের পাশ, চোখের কোণা থেকে ল্যাকটো ক্যালামাইনের গোলাপী দাগগুলো মুছে ফেললাম। তারপর টাই-নট্‌টা একটু ঠিক করে নিয়ে কোটের পকেটে পাশপোর্ট আর ট্রাভেলার্স চেকগুলো পুরে নিলাম। নীচে ব্যাঙ্ক থেকে চেকগুলো ভাঙ্গিয়ে নিয়ে মাস্কি রোড বা খান খালিল বাজারে গিয়ে কিছু কেনা কাটার উদ্দেশ্যে গজেন্দ্র গমনে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

লিফট্ থেকে বেরিয়ে ডান দিকের কোণায় ব্যাঙ্কের কাউন্টারে গিয়ে বিশেষ ভীড় দেখলাম না। দু'চারজন বিদেশী টুরিস্টদের পাশে একজন শাড়ি পরিহিতা যুবতীকে এক ঝলক দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল দক্ষিণ ভারতীয়। যাই হোক সে ঐ ঝলকই, তার বেশী কিছু নয়। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে পাশপোর্টের মধ্যে চেকগুলো গুঁজে এগিয়ে দিয়ে

একটু পাশে সরে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। সিগারেট টানতে টানতে হয়তো কোন আধেক-আবৃত কোন বিদেশিনীকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় আমার নাম ধরে কে যেন ডাকতেই সম্বিত ফিরে এলো। বুঝলাম ব্যাঙ্ক কাউণ্টার থেকে তলব এসেছে। চেকগুলোতে আর একবার সই করে ইজিপ্‌সিয়ান পাউণ্ডের নোটগুলো তুলে নিয়ে একটু এগুতেই হঠাৎ এক নারী কণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করলেন—আপনি বাঙালী ?

সেদিন নাইল হিলটন হোটেলের লাউঞ্জে দিনে দুপুরে ভূত দেখলেও নিশ্চয়ই অতটা আশ্চর্য হতাম না. যা আশ্চর্য হয়েছিলাম অকস্মাৎ এক নারী কণ্ঠে বাংলা কথা শুনে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শুধু বললাম, হ্যাঁ।

একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলাম, আপনিও বাঙ্গালী নাকি ?

একটু হেসে তিনি বললেন, কেন ? কথা শুনে কি মনে হচ্ছে জাপানী ?

নিজের বোকামির জন্য নিজেই ভীষণ লজ্জিত বোধ করলাম ! শুধু বললাম, অনেকদিন পর বাংলা কথা শুনে ব্রেনটা ঠিক রিএ্যাক্ট করতে পারেনি ! তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কায়রোয় নাইল হিলটন হোটেলের লাউঞ্জে যে বাংলা কথা শুনব তা কল্পনাও করতে পারিনি···

এই ভাবেই ডাক্তারের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তারপর ঐ লাউঞ্জের একপাশে দাঁড়িয়েও ডাক্তারকে জানিয়েছিলাম, দুনিয়ার কোন চুলোয় ঠাঁই না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জার্নালিজম করছি এবং বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের গুণী-জ্ঞানী শিক্ষিত লোকদের আমার লেখা পড়তে হচ্ছে।

'কেন এ কথা বলছেন ? জার্নালিজম তো চমৎকার প্রফেশন, আর নিশ্চয়ই ভাল লেখেন···'

'থাক, থাক, আর এগুবেন না।'

ডাক্তারও তার নিজের কথা শুনিয়েছিল। শুনিয়েছিল, সে দেশ থেকে এম. বি. বি এস. পাস করে হাসপাতালে চাকরি করতে করতে

বৃত্তি লাভ করে শিশু-যক্ষ্মারোগীদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য পশ্চিম জার্মানীর স্টুটগার্টে ছিল দু' বছর। এখন ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরছে। জার্মানীতে থাকার সময় ছুটিতে কন্টিনেন্ট ঘুরেছে, কিন্তু মিডল ইস্ট দেখেনি। তাইতো এবার বেইরুট দেখে কায়রো এসেছে।

কপাল থেকে উড়ন্ত চুলগুলো সরিয়ে, পড়ন্ত সিল্কের শাড়ির আঁচলটা টেনে নিতে নিতে ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, আপনি কি কোন জরুরী কাজে বেরুচ্ছেন ?

'বালাই ষাট এখানেও জরুরী কাজ! ভাবছিলাম খান খালিল বাজারে একটু ঘোরাঘুরি করব।'

ডাক্তার লিফট্-এর দিকে পা বাড়িয়ে বললো, বাজারে পরে যাওয়া যাবে। এখন চলুন ঘরে গিয়ে একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

ডাক্তারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি লিফটে চড়লাম, চার তলায় লিফট্ থেকে বেরিয়ে এলাম এবং তারপর ডানদিকে ঘুরে কোণার ঘরে গেলাম। ঘরে না বসে আমি এগিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আর এক নজর ঐতিহাসিক নাইলকে দেখলাম। আমি বললাম, আমার ঘরের ব্যালকনির চাইতে আপনার এই ব্যালকনি থেকে নাইলকে আরো অনেক ভালভাবে দেখা যায়।

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তারের আহ্বানে আমি ঘরের ভিতর এসে কোটটা খুলে ফেললাম বিছানার 'পর। বসে পড়লাম সোফায়। ডাক্তার আমার কোটটাকে হ্যাঙ্গারে চড়িয়ে ওয়াড্রবে রাখতে গিয়ে বললো, কোটটাকে তুলে রাখছি, বুঝলেন ?

আমি একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বললাম, এমনি করে একে একে আমার আরো দায়িত্বগুলো স্বেচ্ছায় তুলে নেবেন নাকি ?

ওয়াড্রবে কোটটা ঝোলাতে ঝোলাতে বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললো, বিদেশ বিভূঁইতে একটা বাঙ্গালী মেয়েকে একলা পেয়ে ভয় দেখাচ্ছেন কেন বলুন তো ?

আমি বললাম, তাই বুঝি ?

ওয়াড্রব বন্ধ করে ডাক্তার আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো, এবার বলুন কি খাবেন ?

আমি নির্বিকার হয়ে উত্তর দিলাম, তেলে ভাজা আর মুড়ি।

ডাক্তার না হেসে পারল না। বললো, আপনি তো আচ্ছা লোক !

'কেন বলুন তো ?' ন্যাকামি করে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'কেন আবার ? এখানে মুড়ি তেলে ভাজা পাব কোথায় ?'

'বাঙ্গালী বলে স্বেচ্ছায় আলাপ করলেন, আদর করে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন, তাই ভাবছিলাম হয়তো বাঙ্গালীর খাবারই খাওয়াবেন।'

ডাক্তার আর কথা না বাড়িয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে টেলিফোনে কফির অর্ডার দিল। কফি এলো। ডাক্তার আমার সামনের সোফায় বসে কফি তৈরি করে আমাকে দিল।

সেদিন ঐ কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল, তার সুর আজও আমার কানে বাজে। কফির কাপে প্রথম চুমুক দিয়েই ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি বাংলা দেশে মানুষ হয়েছেন।

'না।'

'তবে তো আপনি খাঁটি বাঙ্গালীই নন।'

'তাই বুঝি ?'

ঘাড় বেঁকিয়ে ডাক্তার বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিনিট দুই চুপচাপ থেকে শেষ চুমুক কফি খেয়ে ডাক্তার বললো, যে বাঙ্গালী কর্ণফুলি—বুড়িগঙ্গা দেখেনি, যে মেঘনায় নৌকো চড়েনি, যে গোয়ালন্দ ঘাটে ইলিশ মাছ খায়নি, যে নবদ্বীপ আর শান্তিনিকেতন দেখেনি, সে আর যাই হোক খাঁটি বাঙ্গালী নয়।

চোখটা উপরে উঠিয়ে ঘাড়টা আবার বাঁকা করে ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বুঝলেন জার্নালিষ্ট ?

মাদ্রাজীদের মতো এমনভাবে আমি ঘাড় নাড়ালাম যে হ্যাঁ না—দুই-ই হতে পারে।

আলোচনা আরো একটু এগিয়ে চললো। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো, দিল্লীতে আপনারা কে কে থাকেন ?

আমি জানালাম, আমি থাকি, রামচন্দ্র নামে একটা চোর চাকর থাকে ; আর আছে দুটো বেড়াল, একটা কুকুর।

'কেন আপনি বিয়ে করেন নি ?'

'ছোটবেলা থেকেই তো একটা ফুটফুটে সুন্দর বৌ ঘরে আনার স্বপ্ন দেখে আসছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তো জুটলো না।'

ডাক্তার উড়িয়েই দিলো আমার কথাটা। বললো, তাহলে নিশ্চয়ই কাউকে পছন্দ করে রেখেছেন।

'পছন্দ তো অনেককেই হয়েছে, কিন্তু তাদের পাচ্ছি কোথায় বলুন ?'

ডাক্তার নাছোড়বান্দা। আমার রোগটা ধরবার নেশায় মশগুল হয়ে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলো, বলুন না কাকে পছন্দ করে পাচ্ছেন না ?

'পছন্দ তো এলিজাবেথ টেলর—আঁদ্রে হেপবার্নকেও করেছি। কিন্তু পাচ্ছি কোথায় বলুন ?'

ডাক্তার বললো, কেন দুষ্টুমি করছেন ? সোজা কথায় বলুন না প্রেমে পড়েছি, পরে বিয়ে করবো।

আমি বললাম, ডাক্তার ফর গডস সেক হোল্ড ইওর টাংগ। এমন ভাবে জেরা করলে নার্ভাস হয়ে আমি সব কিছু বলে ফেলব।

ডাক্তার শুধু মুচকি হেসে বললো, আপনাকে দেখেই বোঝা যায় যে আপনি বেশ দুষ্টু লোক, বুঝলেন ?

আমাদের নাইল হিলটন হোটেলের পাশ দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নাইল নদী যেমন ধীরে ধীরে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছিল, আমাদের আলোচনাও তেমনি ধীরে ধীরে এক অদৃশ্য বন্ধনের দিকে টেনে নিয়েছিল।

ডাক্তার একবার জানলা দিয়ে বাইরের বিরাট আকাশের দিকে

চাইল, একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিলো। একটু চুপ করে রইল। তারপর নরম গলায় বললো, একটা কথা বলবো ?

'নিশ্চয়ই। একটা কেন একশোটা বলুন।'

'দুঃখ পাবেন না ?'

'না, না, দুঃখ পাব কেন ? আপনার যা ইচ্ছা বলুন।'

ডাক্তার একটু চুপ করে গেল। তারপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে হঠাৎ বলে ফেলল, আমি মুসলমান, আমি ইস্ট পাকিস্তানের লোক।

কেন জানি না, এক মুহূর্তের জন্য আমার বুকের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে গেল কিন্তু তবুও নিজেকে সামলে নিলাম। সহজ হয়েই বললাম, তাতে কি হয়েছে ? বাংলা দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই কায়রোতে বসে আজ আমার কাছে আপনার একমাত্র পরিচয় আপনি বাঙ্গালী। সুতরাং আপনি হিন্দু কি মুসলমান, আপনার বাড়ি বাঁকুড়ায় কি বগুড়ায়—তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

ডাক্তারের চোখ মুখ দেখে মনে হলো সে যেন আমার কথায় অনেকটা স্বস্তি ও শান্তি পেয়েছে।

কথায় কথায় বেলা হয়েছিল। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এবার চলি। আপনি লাঞ্চ খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

'কেন একসঙ্গে লাঞ্চ খেলে জাত যাবে ?'

'ছি, ছি, আপনি কি বলছেন ?'

ডাক্তারের ঘরে বসেই সেদিন দুজনে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিলাম। পরমাত্মীয়ার মতো যত্ন করে আমাকে সে খাইয়েছিল। ওজর আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে প্রায় সব মাংসটাই আমার প্লেটে ঢেলে দিয়েছিল।

নাইল নদীর জল আরো গড়িয়েছিল। সোফা ছেড়ে ডাক্তারের বিছানায় বালিশটা পিঠে দিয়ে একটু কাৎ হয়ে বসেছিলাম। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, তুমি একটু শোবে ?

'না, না, শোব না।'

'কেন লজ্জা করছে ? নাকি দুর্নামের ভয় ?'

ডাক্তার আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, কিন্তু উত্তর সে নিজেই দিয়েছিল।

'ভয় নেই বাচ্চু, এটা বাংলা দেশ নয় যে দুর্নাম রটবে। তুমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শুতে পারো।'

ডাঃ মৈমুনা সুলতানার আরো অনেক স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে রজনীগন্ধার মতো মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। আবার একটু পরেই ঝরা বকুলের মতো বেদনা বোধ করি মনে মনে। খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েও ঐ দুটি দিনের রিপোর্ট লেখার ক্ষমতা আমার নেই। মানুষের মুখের কথার আমি রিপোর্ট লিখি, কিন্তু মনের কথা লেখবার বিদ্যা তো আমার জানা নেই। তবে মনে পড়ে···

ডাক্তার হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল। দৃষ্টিটা নাইল হোটেলের জানলা থেকে নাইল নদী পেরিয়ে অনেক দূর চলে গেল, চলে গেল পদ্মা—মেঘনা-বুড়ীগঙ্গা—কর্ণফুলির দেশে।

'জানো বাচ্চু, কে আমাকে প্রথম এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন?'

আমি চুপ করেই রইলাম।

'জগন্নাথ কাকা। শুনেছি মার পেটে থেকে বেরুবার পর আমি কোন কান্নাকাটি না করায় বাড়ির সবাই ভাবলেন আমি বেঁচে নেই। জগন্নাথ কাকা কোন কথা না বলে এক কড়া গরম জল চেয়ে নিলেন। তারপর আমার পা দুটো ধরে গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে এনে পিঠে পটাপট চড় মারতে লাগলেন। আধ ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট এই রকম জলের তাপ আর জগন্নাথ কাকার চড় খেয়ে আমি হঠাৎ কেঁদে উঠলাম। বাবা ছুটে এসে জগন্নাথ কাকাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, জগন্নাথ! গত জন্মে তুই নিশ্চয়ই আমার ভাই ছিলি, নয়তো মেয়েটা তোরই মেয়ে ছিল। জগন্নাথ কাকা কোনদিন আমাদের বাড়িতে এসে ভিজিট নিতেন না; তাইতো বাবা নিজের হাতের সোনার ঘড়িটা খুলে তাঁর হাতে পরিয়েছিলেন।

জগন্নাথ ডাক্তার নিজের মেয়ের চাইতে মৈমুনাকে কম ভাল

বাসতেন না। হাটের দিন ডিসপেন্সারী থেকে ফেরার পথে মৈমুনার জন্যও এক প্যাকেট মিষ্টি আসত। একটু বড় হলে দুরন্তপনা বা দুষ্টুমি করার জন্য মা মারধর করতে এলেই মৈমুনা ছুটে পালাত জগন্নাথ কাকার বাড়িতে। পূজার সময় মৈমুনাও নতুন জামা পেতো তার জগন্নাথ কাকার কাছ থেকে।

নাইলের পাড়ে বসে ডাক্তারের মনে অতীত স্মৃতি যেন ভীড় করে এসেছিল। তাঁর মনে পড়ল মালতী নগরের বড় বাড়ির দুর্গাপূজার কথা, কালীদাদুর সুর করে মন্ত্রপড়ার কথা। মনে পড়েছিল, পূজার ক'দিন আগেই হারানে তার দলবল নিয়ে আসত ঢাক বাজাতে। হারানের ঢাকের আওয়াজ শুনলেই ওরা সবাই ছুটে আসত বড় বাড়িতে। হারানে বড় বাড়িতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই এক চোট নেচে বাজিয়ে দেখাত। তারপর হারানে দিদার দেওয়া জলপানি খেতে বসলে ঢাক তুলে নিতো কনকদা। আহা সে কি বাজনা! আরতির সময় হারানে আর কনকদার ঢাক বাজানো শুনতে ডাক্তার পূজার প্রতি সন্ধ্যায় ছুটে এসেছে বড় বাড়িতে। অমন বাজনা নাকি ডাক্তার আর কোথাও শোনেনি।

আর কি মনে পড়ে?

মনে পড়ে বুড়ো শিবতলার মেলার কথা, মনে পড়ে রথের কথা। সেদিন কে হিন্দু, কে মুসলমান সে খবর কেউ রাখত না বা রাখার প্রয়োজন বোধ করত না। গ্রামের সবাই মেতে উঠত একই আনন্দে। কেন মহরমের দিন? জগন্নাথ কাকা, যতীন পাকড়াশী, গদাই চক্রবর্তী, হালদার মাস্টার সবাই আসত ডাক্তারদের বাড়ি। ধর্মের গোঁড়ামি ছিল, সংস্কার ছিল, কিন্তু মানুষকে ভালবাসায় কোন দ্বিধা ছিল না।

এইত প্রথম দাঙ্গা বাধলে জগন্নাথ ডাক্তার উড়ো চিঠি পেল: মৈমুনার বাবা ছুটে গিয়েছিলেন মুন্সীপাড়ার দলবল নিয়ে। বলেছিলেন, জগন্নাথ, ভয় করিস না। জেনে রাখিস আমি না শেষ হলে তোর এক ফোঁটা রক্ত পড়বে না তোর এই বাপ-ঠাকুরদার ভিটেয়। ঠিক তাই-ই হয়েছিল। গজখালির মুসলমানরা জগন্নাথ ডাক্তারের

বাড়ি আক্রমণ করলে রক্তপাত হয়েছিল মৈমুনার বাবার, জগন্নাথ ডাক্তারের নয়।

ডাক্তার আমার হাতটা চেপে ধরে বললো, জানো বাচ্চু সেই জগন্নাথ কাকাও একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন, মালতি নগরের বড় বাড়ির পূজা বন্ধ হলো, কনকদার আর হারানের হাতে আর ঢাকের আওয়াজ শোনা যায় না, বুড়ো শিবতলা জঙ্গলে ভরে গেল, রথের মেলাও বন্ধ হলো।

অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তার চোখের জল আটকাতে পারল না। উত্তেজনায় ঠোঁটটা কেঁপে উঠল। বললো, বলতে পার বাচ্চু, জগন্নাথ কাকাকে হারিয়ে আমি সুখী, না তোমার শিয়ালদ' প্ল্যাটফর্মে ভিখারীর মতো পড়ে থেকে সুখী? তুমি তো জার্নালিষ্ট, বলতে পার বাংলা দেশটা কেন এমন ছারখার হয়ে গেল?

ডাক্তারের কোন প্রশ্নের জবাব আমি দিইনি, দেবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। শুধু ডাক্তারকে কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছিলাম।

আজ সেই দুটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা রোমন্থন করতে গিয়ে টুকরো টুকরো আরো অনেক কিছু মনে পড়ছে। ঘোরাঘুরি করে আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম। ফিরে এসেই ঝপাং করে ডাক্তারের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ডাক্তার চেঞ্জ করতে বাথরুম থেকে বেরুবার আগেই আমি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তার আলতো করে আমার জুতা-মোজা-টাই খুলেছিল, আমাকে পাশ ফিরিয়ে ভাল করে শুইয়ে দিয়েছিল। দু'এক ঘণ্টা পরে আমাকে জোর করে তুলে ডিনার খাইয়েছিল। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই শোনেনি। বলেছিল, এত ঘোরাঘুরির পর রাত্রে না খেলে শরীর ভীষণ দুর্বল হবে।

পরের দিন আমাকে নিজে পছন্দ করে টাই পরিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দেখ কি চমৎকার দেখাচ্ছে। একটু দুষ্টুমি করে আমার মুখটা ধরে বলেছিল, নাউ রিয়েলি ইউ ল্যুক লাইক এ হ্যাণ্ডসাম ইয়ংম্যান।

'তাই বুঝি ?'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। পিরামিডের চূড়া রাঙ্গিয়ে সূর্য অস্ত গেল। ডাক্তার আবার উদাস হলো।

ব্যালকনিতে দুটো পিপিং চেয়ারে দুজনে বসেছিলাম। ডাক্তার আমার হাতটা নিয়ে খেলা করছিল। খেলা থেমে গেল, হঠাৎ কোথায় তলিয়ে গেল। একটু পরে দেশের কথা আবার শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে আমার হাতটাকে টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র কি শুধু হিন্দুদের, নজরুল বা জসীমউদ্দীন কি শুধু আমাদের ? বাংলার পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, কবি গান কি শুধু হিন্দুদের, না মুসলমানদের ? আমরা লড়াই করেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি, কিন্তু তাই বলে কি বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের দেহে একই রক্ত বইছে না ? বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের জন্য পলাশীর মাঠে হিন্দু-মুসলমানের কি মিলিত রক্তপাত হয়নি ?

ডাক্তাব আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, বাচ্চু, তুমি তো জার্নালিষ্ট। বল না, কেন এমন হলো ? কেন আজ বাঙ্গালী বাংলা দেশে চোখের জল ফেলছে ?

আমরা দুজনে একই ফ্লাইটে কায়রো থেকে করাচী এলাম। দুজনের মনটাই ভারী হয়েছিল, বিশেষ কেউই কথাবার্তা বলিনি। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি করাচীতে কোথায় থাকবে ?'

'হোটেল ইণ্টার কন্টিনেণ্টালে।'

শেষ রাতের দিকে পায়ের 'পর থেকে কম্বলটাকে দুজনেরই গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছিল। আর ? আর একটু নিবিড় হয়ে আমার বুকের 'পর মাথা রেখেছিল।

ভোর বেলায় প্লেন করাচী পৌঁছল। পাকিস্তানের মাটিতে পা দিতে দিতেই ডাক্তার এমন করে আমাকে আঘাত দেবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। যতবার কাছে গেছি, ততবার সরে গেছে ; যতবার কথা বলেছি, ততবার ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করেছে।

কাস্টমস এনক্লোজারের বাইরে বেরুবার আগে ডাক্তার আমাকে এমন তাচ্ছিল্যভাবে অগ্রাহ্য করল যে আমি মর্মাহত না হয়ে পারলাম না। কোন প্লেন থাকলে হয়তো সিটিতে না ঢুকে দিল্লীই ফিরে আসতাম।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত কতকগুলো খবরের কাগজ কিনে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল রওনা হলাম। খবরের কাগজগুলো খুলে চমকে উঠলাম। বুঝলাম ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহাকাশে ঘোর ঘনঘটা দেখা দিয়েছে, ভারতকে শায়েস্তা করার নেশায় পাকিস্তান উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

পরের দিন রাত আড়াইটের সময় আবার প্লেন। তাই কাজ কর্ম সন্ধ্যার মধ্যেই সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেব। হোটেলে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ডাইনিং রুমে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি ঠিক এমনি সময় কে যেন দরজায় নক্ করল। দরজা খুলতেই ডাক্তারকে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হাসিমুখে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করতে পারলাম না, গম্ভীর হয়েই বললাম, এসো।

ডাক্তার হাতের প্যাকেটগুলো টেবিলের উপর রেখে সামনে এসে অসহায়ার মতো আমার দিকে চাইল। দু'হাত দিয়ে আমার মুখটা ধরে বললো, তুমি খুব রাগ করেছ, তাই না বাচ্চু?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ডাক্তার দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে বললো, কি করব বলো। এয়ারপোর্টে বেশী কথাবার্তা বললে হয়তো তুমি কিছু মুস্কিলে পড়তে, নয়তো আমার কোন ঝঞ্ঝাট বাধত। তাইতো···

এতক্ষণে হুঁস হলো ডাক্তারকে বসতেও বলিনি। বললাম, বোসো।

ডাক্তার সোফায় না বসে বিছানায় বসল। আমার হাত ধরে পাশে বসাল। আমার দিকে একবার চাইল। দু'চার মিনিট দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল ডাক্তার।

'বলো না, তুমি আমার 'পর রাগ করনি, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।'

আমি শুধু বললাম, কোন্ অধিকারে তোমার 'পর রাগ করব বলো? বাঙ্গালী বলে বিদেশ বিভূঁইতে তুমি আমাকে যে ভালবাসা, যে মর্যাদা দিয়েছ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এর চাইতে বেশী কিছু প্রত্যাশা করা তো আমার অন্যায়।

এবার ডাক্তারের দিকে ফিরে বললাম, আর ক্ষমা? তুমি হাসালে ডাক্তার! আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইবে কেন?

ডাক্তারের চোখের জলের কাছে শেষ পর্যন্ত আমাকে হার মানতে হলো। বললাম, হ্যাঁ, রাগ করেছিলাম, দুঃখ হয়েছিল কিন্তু এখন আর কিছু নেই।

আমার ডান হাতটা টেনে নিজের বুকের 'পর রেখে ডাক্তার বললো, আমাকে ছুঁয়ে বলো তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

আমি আর কথা বলিনি। দু'হাত দিয়ে ডাক্তারকে টেনে নিয়েছিলাম নিজের বুকের মধ্যে।

একটু পরে আমার গলা থেকে টাইটা খুলে একটা নতুন টাই বেঁধে দিল। টাই-এর নট্‌টা ঠিক করতে করতে বললো, তুমি তো জার্নালিষ্ট। কত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তোমার নিত্য ওঠা বসা। তোমার পক্ষে আমার মতন একটা সাধারণ বাঙ্গালী মেয়েকে নিশ্চয়ই মনে রাখা সম্ভব নয়।

নট্‌টা বাঁধা হয়ে গেলে টাইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ডাক্তার বললো, আমি কিন্তু তোমাকে কোনদিন ভুলব না।

ডাক্তার আমার বিদায় বেলার একটি মুহূর্তও নষ্ট করেনি। বলেছিল, বাচ্চু, তুমি এবার একটা বিয়ে কর। আর দেরী কোরো না। তাছাড়া তোমাকে যেন একলা ভাল লাগে না! তোমাকে একলা ভাবতেও ভাল লাগে না।

হাসপাতালে ডাক্তারের ডিউটি ছিল। অনেক দেরী হয়েছিল, আর দেরী করল না। টেবিলের 'পর থেকে প্রেজেনটেশনের প্যাকেটগুলো এনে আমার হাতে দিল, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। দুজনে মুখোমুখি নীরবে চোখের জল ফেলেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর ধীর পদক্ষেপে ডাক্তার চলে গেল আর আমি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললাম।

বিধাতা খুরুষের ঔদার্য অনেক, কিন্তু কৃপণতাও কম নয়। এই দুনিয়ার সর্বত্র তাঁর বদান্যতার প্রকাশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে কৃপণ মনোবৃত্তির অসংখ্য পরিচয়। এই পৃথিবীর একদিকে যখন আলো, অন্যদিকে তখনই অন্ধকারের রাজত্ব চলে। অনন্তকাল ধরে এই সনাতন নিয়ম পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করে চলেছে। পৃথিবীর দুটি দিক একই সঙ্গে সূর্যের আলোয় ভরে উঠবে না, অন্ধকারের মধ্যেও ডুব দেবে না।

এই পৃথিবীর বুকে যে মানুষের বাস তার জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই! অজস্র কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ভগবান একটি পরিপূর্ণ সুখী মানুষ তৈরী করতে পারেননি। জীবনের একদিকে যার আলোয় ভরে গেছে, সাফল্যে ঝলমল করে উঠেছে, তারই জীবনের অপর দিকে নিশ্চয়ই অন্ধকারের রাজত্ব। সমাজ-সংসার যার মুখের হাসির খবর রাখে, যার সাফল্যের ইতিহাস জানে, তার মনের কান্না, ব্যক্তিগত জীবনের চরম ব্যর্থতার কাহিনী সবাই না জানলেও তা সত্য। এই দুনিয়ায় কেউ প্রকাশ্যে, কেউ লুকিয়ে কাঁদে, কিন্তু কাঁদে সবাই। অত বড় সর্থক, সাফল্যমণ্ডিত ডিপ্লোম্যাট মিঃ পরিমল বোসও

কাঁদতেন। তবে তাঁর চোখের জলের কাহিনী, ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস কেউ জানে না, জানবেও না।

ভারতবর্ষের ফরেন সার্ভিসের সবাই পরিমল বোসকে চেনেন। তাঁর সুখ্যাতির কাহিনী ভারতের প্রায় সমস্ত দূতাবাসে শোনা যাবে, শোনা যাবে দিল্লীর সাউথ ব্লকে ফরেন মিনিষ্ট্রীতে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে আসার আগে মিঃ বোস ওয়াশিংটন, কায়রো, মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস্-এ কাজ করে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং সর্বত্রই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি প্রচারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই তো সেবার লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে শেষের দিন মূল ইস্তাহার নিয়ে ভীষণ মতভেদ দেখা দিল কয়েকটি দেশের মধ্যে। মার্লবোরা হাউসের কনফারেন্স চেম্বারে ঝড় বয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মিঃ বোসের ড্রাফট্ মেনে নিলেন সবাই।

পরে ক্ল্যারিজেস হোটেলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মিঃ বোসের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। দিল্লী ফিরে বিজ্ঞান ভবনে এক বিরাট সাংবাদিক সম্মেলনেও মিঃ বোসের কূটনৈতিক বুদ্ধির প্রশংসা করতে তিনি দ্বিধা করেননি!

কর্মজীবনে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছেন মিঃ বোস। সার্থক, সাফল্যমণ্ডিত ডিপ্লোম্যাট মিঃ পরিমল বোসের খবর সবাই জানেন, জানেন না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র ও বেদনাভরা ইতিহাস···

···রিটায়ার করার ঠিক আগের বছর সোনার বাংলা দু'টুকরো হলো। দেশ স্বাধীন হলো। প্রফুল্লবাবু সপরিবারে চলে এলেন কলকাতায়। সরকারী চাকরী থেকে রিটায়ার করার পরই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় মধ্যমগ্রাম দেশহিতৈষী কলোনীতে কয়েক কাঠা জমি কিনলেন, ছোট একটা মাথা গোঁজবার আস্তানা তৈরী করলেন। একদিন মধ্যমগ্রামের যে জমি পতিত ছিল, যে জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের অগম্য ছিল, বছর কয়েকের মধ্যে সেইখানেই নবাগত

কয়েক শ' পরিবারের কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে নানা ধরনের ঘর বাড়ী উঠে পড়ল, ছন্নছাড়া কিছু মানুষ আবার স্বপ্ন দেখল ভবিষ্যতের। প্রথম বছর সম্ভব হয়নি, কিন্তু পরের বছরই দুর্গাপূজা শুরু হলো। কলোনীর একদল ছেলে-মেয়ে মিলে নববর্ষ—রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব চালু করল। কিছুদিনের মধ্যে দেশহিতৈষী পাঠাগারও গড়ে উঠল। প্রাণচঞ্চল নতুন কলোনীতে আরো অনেক কিছু হলো। মানুষে-মানুষে পরিবারে-পরিবারে হৃদ্যতার গাঁটছড়াও বাঁধা পড়ল।

বোসদের বাড়ীর পরেই একটা পুকুর। তার ওপাশে রাখালদাদের বাড়ী। এই কলোনীতে আসার পরই রাখালদার ছোট দুটি বোনের বিয়ে হলো। কলোনীর প্রায় সবাই এসে সাহায্য করেছিলেন বিয়েতে, কিন্তু পরিমলের মতো কেউ নয়। জামাইরা তো প্রথম প্রথম বুঝতেই পারেনি পরিমল ওদের আপন শালা নয়।

পরিমল যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে তখন রাখালদার বিয়ে হয়েছিল। রাখালদার বাবার সঙ্গে পরিমলই প্রথম রাণাঘাট গিয়ে তার বীথিকা বৌদিকে দেখে এসেছিল। রংটা একটু চাপা হলেও দেখতে শুনতে বীথিকা বৌদিকে ভালই লেগেছিল। ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠেই পড়াশুনা ছাড়লেও পড়াশুনার চর্চা ছিল। গান-বাজনা না জানলেও সখ ছিল। স্কুলে পড়ার সময় মাঝে মাঝে থিয়েটারও করেছেন।

বেশ ভাল ভাবেই রাখালদার বিয়ে হলো। প্রফুল্লবাবু বরকর্তা হয়ে গিয়েছিলেন আর পরিমলের 'পরই সব দায়িত্ব ছিল। বৌভাতের দিন শ' দেড়েক লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা থেকে শুরু করে লাউড স্পীকারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা—সব কিছুই পরিমল করেছিল।

বীথিকা বৌদিকে বিয়ে করে রাখালদা বেশ সুখী হলেন। জীবনে যাঁরা আকাশকুসুম কল্পনা করে না, যাঁদের চাওয়া ও পাওয়া দুটোই সীমাবদ্ধ, মনের মতন স্ত্রী- পাওয়াই তাঁদের সব চাইতে বড় কাম্য। রাখালদা বি-এ পাস করে ফেয়ারলি প্লেসে রেলের বুকিং অফিসে

মোটামুটি ভালই চাকরি করতেন। মাইনে হয়তো খুব বেশী পেতেন না, কিন্তু পাকা সরকারী চাকরিতে অনেক শান্তি অনেক নির্ভরতা। তবে খাটুনি ছিল বেশ। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন আর বাড়ী ফিরতে ফিরতে প্রায় আটটা-সাড়ে আটটা বাজত। বেশীদিন সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরি করলে ছুটির দিন তাসখেলা ছাড়া বড় একটা সখ-আনন্দ কারুর থাকে না। রাখালদার সে সখও ছিল না। তবে হ্যাঁ, রবিবার দুপুরে একটু দিবানিদ্রা ও পরে ইভিনিং শো'তে একটা সিনেমা দেখা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস।

বীথিকা বৌদির জীবনটাও একটা ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ল। ভোরবেলায় উঠে রান্না-বান্না করে স্বামীকে অফিস পাঠানোই ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। রাখালদা অফিসে চলে গেলে শ্বশুর-শাশুড়ী ও নিজের রান্না করতেন। সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা রান্নাঘর নিয়ে পড়ে থাকতে তাঁর মন চাইত না। তাইতো শ্বশুর-শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়া হতে না হতেই রাত্রের রান্না শুরু করে দিতেন। নিজের খাওয়া-দাওয়া মিটতে মিটতে একটু বেলা হতো তবে ওবেলার কোন তাড়া থাকত না, এই যা শান্তি।

বেলা একটু পড়তে না পড়তেই রাখালদার মা উঠে পড়তেন। ইতিমধ্যেই একটু বিশ্রাম করে বীথিকা বৌদি যেতেন পরিমলের মা, মাসিমার কাছে। একটু গল্প-গুজব করতে না করতেই পরিমল ঠাকুরপো কলেজ থেকে ফিরত। তারপর বৌদির সঙ্গে শুরু হতো কলেজের গল্প। কলকাতার কলেজে প্রতিদিন কত মজার ঘটনাই না ঘটে। বৌদি কলেজে যেতেন না, কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে গল্প শুনে সে সব মজা উপভোগ করতেন। শুধু গল্প শোনানো নয়, পরিমল ঠাকুরপোর আরো অনেক কাজ ছিল। বই পড়া ছিল বৌদির নেশা। দেশহিতৈষী পাঠাগারে যেসব বই আছে, সেসব অনেকদিন আগেই পড়া। কলেজ লাইব্রেরী থেকে নিত্য বই আনা ছিল পরিমল ঠাকুরপোর অন্যতম প্রধান কাজ। সাপ্তাহিক—মাসিক পত্রিকাও নিত্য আসত। বৌদির ভীষণ ভাল লাগত। বিয়ের আগে

রাণাঘাট শহরের যেখানেই কোন গানের জলসা হোক না কেন, বৌদি শুনতেন। বিয়ের পর এসব সখ-আনন্দের কথা প্রথম বলে ছিলেন পরিমল ঠাকুরপোকে, 'আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমাদের কলেজে বা এদিকে কোন পাড়ায় জলসা হয় না ?'

'সে-কি বৌদি ! তুমি কি একটা আশ্চর্য প্রশ্ন করলে বল তো ? কলকাতার কলেজে শুধু গানের জলসা কেন, বক্তৃতার জলসা, পলিটিক্সের জলসা ও আরো কত রকমের জলসা হয়। হয় না শুধু পড়া-শুনার জলসা !'

'তাই নাকি ঠাকুরপো ?'

'তবে আবার কি ?'

ঠাকুরপো একটু চুপ করে আবার শুরু করে, 'বাল্মিকীর মতো ভাল ইম্যাজিনেটিভ রাইটার বা কালিদাসের মতো ভাল রোমান্টিক কবি থাকলে একালে কলকাতার যে কোন এক একটি কলেজ নিয়ে রামায়ণ বা শকুন্তলার চাইতে আরো মোটা, আরো ভাল বই লিখতে পারতেন।'

বৌদি একটু মুচকি হাসেন !

'তুমি হাসছ বৌদি ! কিন্তু বিশ্বাস কর, কলকাতার কলেজগুলো এক-একটি আজব চিড়িয়াখানা। ছাত্র-অধ্যাপক সবাই রসিক। আদি-রস, বাৎসল্য-রস, বীর-রস, ভয়-রস, বীভৎস-রস ও আরো অনেক রসের মশলা একত্রে যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে তা কলকাতার কলেজ।'

পরিমল ঠাকুরপোর কাছে গল্প শুনতে বেশ লাগে বৌদির। কলেজের সোস্যালের সময় জলসার দুটো কার্ড জোগাড় করে পরিমল। রাখালদাকে কার্ড দুটো দিয়ে বলে, শুধু চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেন-ডেন্টের সেবা না করে একটু বৌদির সেবাও করো।

রাখালদার জলসা-টলসায় কোন আগ্রহ নেই। এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। বলেন, তোর বৌদির যত বাতিক ! মধ্যমগ্রাম থেকে ইউনি-ভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে গিয়ে ক'টা আধুনিক গান শোনার কোন অর্থ হয় ?

রাখালদাকে তবুও যেতে হয়। স্ত্রীর আব্দারের চাইতে পরিমলের আগ্রহকে অগ্রাহ্য করা তাঁর কঠিন হয়। বৌদির কিন্তু বেশ লাগে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানান পরিমলকে।

রাখালদা নিতান্তই একজন ভদ্রলোক। কোন সাতে-পাঁচে নেই। কোন অহেতুক বাতিক নেই। কলোনীর সবার সঙ্গেই পরিচয় আছে, কিন্তু একটু অতিরিক্ত খাতির কারুর সঙ্গে নেই। পরিমল ও বৌদি দুজনেই মাঝে মাঝে সুবিধামত টিপ্পনী কাটেন রাখালদার অফিস নিয়ে। পরিমল বলে, রাখালদা, তুমি মোর লয়াল ছ্যান দি কিং, রাজার চাইতে বেশী রাজভক্ত।

বৌদি বলেন, না, না, ঠাকুরপো। তোমার দাদা হচ্ছেন সি-সি-এস-এর ঘরজামাই।

রাখালদা এসব সমালোচনা মুচকি হাসি দিয়ে এড়িয়ে যান। শুধু বলেন, যার অফিস ফেয়ারলি প্লেসে সে কি করে আনফেয়ার হবে বলো ?

নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে রাখালদার, কিন্তু পরিমল ঠিক তার বিপরীত। প্রতি পদক্ষেপে তার প্রাণ-শক্তির প্রকাশ। দেশহিতৈষী কলোনীর সব কিছুতেই সে সবার আগে। মাস-তিনেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলোনীর ছেলেদের সাহায্যে একটা চমৎকার পার্ক করেছে এই কলোনীরই একটা পতিত জমিতে। প্রত্যেক রাস্তার নামকরণ করে বোর্ড লাগিয়েছে, কেরোসিনের টিন কেটে রং মাখিয়ে ওয়েষ্ট বিন করে সব রাস্তায় ঝুলিয়ে দিয়েছে। রবিবারের সাহিত্য-সভা, মেয়েদের জন্য পূর্ণিমা সম্মিলনী, বাচ্চাদের জন্য আগমনী সংসদও পরিমলের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই কলোনীতে। এত কাজ করেও নিজের পড়া-শুনায় বিন্দুমাত্র গাফিলতি নেই পরিমলের। এরই মধ্যে এক ফাঁকে মতিঝিল কলোনীতে দুটি ছেলেকে পড়িয়ে আসে।

বৌদি হচ্ছে পরিমলের প্রাইভেট সেক্রেটারী। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র টাকাকড়ি জমা রাখে বৌদির কাছে। নিজের

সংসারের টাকা-পয়সার কোন ঝামেলায় না থাকলেও পরিমলের অনেক সংসারের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয় তাঁকে। তবুও ভাল লাগে তাঁর। নিজের সংসারের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে পরিমল হচ্ছে তাঁর একমাত্র বাতায়ন এবং এই একটি বাতায়নের মধ্য দিয়েই তিনি বিরাট দুনিয়ার কিছুটা স্পর্শ, কিছুটা আনন্দ অনুভব করেন।

দিন এগিয়ে চলে।

পরিমল ইকনমিকসে অনার্স নিয়েই বি-এ পাস করল। সারা দেশহিতৈষী কলোনীর সমস্ত মানুষগুলো আনন্দে আটখানা হয়ে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা তাদের খোকনদাকে রিসেপশন দিল, পূর্ণিমা সম্মিলনীর মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে চন্দনের তিলক পরাল। এইসব কাণ্ডের মূল কিন্তু রাখালদা। রেজাল্ট বেরুবার দিন সবচাইতে আগে খবর নেন তিনি। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে একটা চমৎকার ধুতি কিনে ট্যাকসি করে ছুটে এসেছিলেন কলোনীতে। চীৎকার করে সারা দুনিয়াকে জানিয়েছিলেন, পরিমল অনার্স নিয়ে পাস করেছে। বৌদিকে ঠেলে বের করে বলেছিলেন, ওগো, শীগ্‌গির সবাইকে খবর দাও আমাদের খোকন অনার্স নিয়ে পাস করেছে। উত্তেজনায় শুধু বৌদির ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি। নিজে সারা কলোনী ঘুরে-ছিলেন। গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, ইকনমিকসে অনার্স পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

অনেকেই খেয়াল করলেন না কিন্তু বৌদি আর পরিমল দুজনেই খেয়াল করল যে বিয়ের পর এই প্রথম রাখাল সরকার অফিস কামাই করলেন।

শান্ত, স্নিগ্ধ, রাখালদার চাপা ভালবাসার প্রথম প্রকাশে দুজনেই মুগ্ধ হলেন।

সবাই বলেছিলেন এম-এ পড়তে, কিন্তু বৃদ্ধ বাবার পেন্সনের টাকায় আর পড়তে রাজী হলো না পরিমল। মতিঝিল কলোনীর একটা স্কুলে শ' দেড়েক টাকায় মাস্টারী শুরু করে দিল।

ছাত্র থেকে মাস্টার হলো পরিমল, কিন্তু আর কিছু পরিবর্তন হলো

না। এখনও রাত জেগে পড়াশুনা করে, ছাত্র পড়ায়, কলোনীর সব ব্যাপারে পুরো দমে মাথা ঘামায়, বৌদিকে নিয়ে আগের মতোই হৈ-হুল্লোড় করে। সবাই খুশি। প্রফুল্লবাবু খুশি, তাঁর স্ত্রী খুশি; পরিমল খুশি, বৌদি খুশি, রাখালদা খুশি। কলোনীর সবাই খুশি। খুশির মধ্য দিয়েই আরো দুটো বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন পরিমল একটা নতুন স্যুট নিয়ে বাড়ী আসতেই বাবা-মা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার রে! চিরকাল ধুতি পাঞ্জাবি পরে কাটাবার পর এখন আবার কোট-প্যাণ্ট আনলি কেন?

পরিমল বলেছিল, কলেজের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দিল্লী বেড়াতে যাচ্ছি। দিল্লীতে তো ভীষণ শীত, তাই কোট-প্যাণ্ট নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ি, সেই আর কি···

বাবা-মা বলেছিলেন, ভালই করেছিস।

মা সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ী ছুটে গেলেন, জানো দিদি, জানো বৌমা, খোকন দিল্লী যাচ্ছে। ওখানে তো ভীষণ শীত তাই কোট-প্যাণ্টও কিনে এনেছে।

বৌদি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলেন এ-বাড়ী। ঠাকুরপোর হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বললেন, ডুবে ডুবে জল খাওয়া কবে থেকে শিখলে ঠাকুরপো? তুমি যে দিল্লী যাবে, একথা তো একটিবারও আমাকে জানালে না।

বৌদির একটু অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য একটু রসিকতা করে বললো, কি করি বল বৌদি! তোমরা তো বিয়ে-টিয়ে করে বেশ আছ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, আমার তো ওসব কিছু হবে না, তাই মন ভাল করার জন্য একটু ক'দিনের জন্য ঘুরে আসছি।

এক মুহূর্তে বৌদির সব অভিমান বিদায় নিল। ঠোঁটের চারপাশে হাসির রেখা ফুটে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, আজই তোমার দাদাকে বলছি।

বেশ একটু চেঁচিয়েই পরিমল বললো, দোহাই তোমার, একটু তাড়াতাড়ি কর।

যাবার দিন রাখালদাই দায়িত্ব নিলেন পরিমলকে ট্রেনে তুলে দেবার। পরিমল বারবার বারণ করেছিল, কিন্তু রাখালদা বলেছিলেন, তা হয় না খোকন। তুই দিল্লী যাবি আর আমি স্টেশনে যাব না?

পাঁচটার সময় অফিস ছুটি হবার পরই রাখালদা হাওড়া রওনা হয়েছিলেন। একটু ঘুরে-ফিরে ট্রেন ছাড়বার অনেক আগেই প্ল্যাটফর্মে হাজির হলেন। একবার নয়, দু'বার নয়, বহুবার সমস্ত থার্ডক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট তন্নতন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু পরিমলের দেখা পেলেন না। কি মনে করে সেকেণ্ড ক্লাশগুলোতে একবার দেখে নিলেন। তবুও পরিমলকে পেলেন না। ট্রেন ছাড়ার তখন মাত্র মিনিট পনেরো বাকি। একবার পুরো ট্রেনটাই ভাল করে খুঁজতে গিয়ে একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় পরিমলকে আবিষ্কার করলেন। রাখালদা তো অবাক্। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার রে খোকন? একবারে ফার্স্ট ক্লাশে করে দিল্লী চলেছিস!

পরিমল বলেছিল, কি আর করব? কোন ক্লাশে টিকিট না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটেছি।

'তা তোর আর সব বন্ধু-বান্ধব কই?'

পরিমল ঘাবড়ে যায়। একটু সামলে নিয়ে বলে, ওরা সবাই কাল রওনা হবে। আমি একদিন আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা করব কিনা তাই·····।

কয়েক মিনিট বাদেই দিল্লী মেল ছেড়ে দিল।

রাখালদা কি যেন মনে করে রিজার্ভেশন চার্ট দেখলেন। না তো অন্য কারুর পাশ নিয়ে তো যায়নি, নিজের নামেই তো রিজার্ভেশন। তবে নামের পাশে তো টিকিটের নম্বর নয়, ওটা তো একটা সরকারী পাশের নম্বর। রাখালদা একটু আশ্চর্য হন, একবার যেন চমকে ওঠেন! ফার্স্ট ক্লাশ পাশ! সে তো অনেক বড় বড় অফিসার পায়! তবে কি অন্য কিছু? রাখালদার মনে বেশ একটা আলোড়ন হয়।

রাত্রে শুয়ে বৌদিকে বলেন, জানো খোকন ফার্স্ট ক্লাশে করে দিল্লী গেল।

'সে কি গো ?'

রাখালদা একটু চুপ করেন। আবার বলেন, তাছাড়া, টিকিট কিনে যায়নি, সরকারী পাশে গিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাশ তো খুব বড় বড় অফিসাররা পায়। তাই ভাবছিলাম খোকন বোধহয় বেড়াতে যায়নি, নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাপারে গিয়েছে।

বৌদিও একটু চিন্তিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কেউই কাউকে কিছু বলেন না।

দিল্লী থেকে পরিমলের পৌঁছানোর সংবাদ এলো। দিন দশেকের মধ্যে আবার কলকাতায় ফিরেও এলো। শুধু কুতবমিনার-লালকেল্লার গল্প করল ; আর কিছু বললো না।

মাস তিনেক আবার আগের মতো সহজ সরল হয়ে কাটিয়ে দিল পরিমল। স্কুল, টিউশানি, কলোনীর লাইব্রেরী, পূর্ণিমা সম্মিলনী, আগমনী সংবাদ, পার্ক-রাস্তাঘাট ও ওয়েষ্ট বিনের দেখাশুনা আর বৌদিকে নিয়েই বেশ কাটাল।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজে নাম বেরিয়েছে, কিন্তু তবুও কাউকে কিছু বলেনি। যেদিন স্কুলে রেজেষ্ট্রী ডাকে আসল চিঠিখানা হাতে পেল সেইদিন বাড়ী ফিরে সবাইকে জানাল সে ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে জয়েন করছে।

প্রফুল্লবাবু ও তাঁর স্ত্রী আনন্দে চোখের জল ফেললেন। রাখালদা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর খোকনকে, কলোনীর ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আর বৌদি ? আনন্দে আর উত্তেজনায় সবার অলক্ষ্যে পরিমলকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিশ্বাস কর ঠাকুরপো, আমি জানতাম তুমি একদিন জীবনে নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন বৌদি। দু'চোখ তাঁর জলে ভরে গেল। কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। পরিমল সান্ত্বনা জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। মনের মধ্যে এমন কান্না গুমরে উঠল যে তারও স্বর বেরুল না গলা দিয়ে।

দেখতে দেখতে দিনগুলি কেটে গেল। আবার একদিন দিল্লী মেলে চড়ল পরিমল। বাবা-মা, রাখালদা-বৌদি, কলোনীর একদল ছেলেমেয়ে ছাড়াও অনেক মাস্টার ও ছাত্ররাও এসেছিলেন বিদায় জানাতে। ঐ ভীড়ের মধ্যেই এক ফাঁকে বৌদি একবার একপাশে একটু আড়ালে নিয়ে কানে কানে বলেছিলেন, আমাদের ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ঠাকুরপো ?

'সে কথা কি মুখে না বললে তুমি বুঝতে পার না ?'

কেমন যেন একটু ব্যাকুল হয়ে বৌদি আবার প্রশ্ন করেন, বিলেত-আমেরিকা গিয়ে কি তুমি আমাকে ভুলে যাবে ?

বিদায়বেলায় বিয়োগব্যথার ঝঙ্কার বেজে উঠেছিল পরিমলের সারা মনে। বললো, চেষ্টা করেও বোধহয় এ-জীবনে তোমাকে ভুলতে পারব না।

বৌদির সারা মনের আকাশে শ্রাবণের ঘন কালো মেঘ জমে উঠেছিল, কিন্তু হঠাৎ তারই মধ্যে একটু বিদ্যুৎ চমকে একটু আলো ছিটিয়ে গেল। মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বৌদি বললেন, 'সত্যি বলছ ?

সত্যি বলছি।'

সপ্তাহখানেক দিল্লীতে থেকে পরিমল গেল লণ্ডন। কেম্ব্রিজে তিন মাসের রিওরিয়েনটেশন কোর্স করে থার্ড সেক্রেটারী হয়ে চলে গেল ওয়াশিংটনে ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে। দুটি বছর কেটে গেল সেখানে। তারপর সেকেণ্ড সেক্রেটারী হয়ে মস্কোয়, কায়রোয়। তারপর আবার প্রমোশন। ফার্স্ট সেক্রেটারী হয়ে প্রথমে ইউনাইটেড নেশনস-এ, পরে লণ্ডন ইণ্ডিয়ান হাইকমিশনে। কর্মজীবনের এই চাঞ্চল্যকর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনও বিচিত্র পথে মোড় ঘুরেছে। অতীতের সব হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট করে দিয়েছে।

ফরেন সার্ভিসের সার্থক ডিপ্লোম্যাট হয়েও পরিমল পুরোপুরি মিশিয়ে দিতে পারেনি কূটনৈতিক দুনিয়ার আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজের জীবন, অতীতের আদর্শ নিয়ে আজও ছিনিমিনি খেলতে শেখে নি সে। ওয়াশিংটনের পেনসিলভানিয়া এভিনিউ, মস্কোর রেড

স্কোয়ার, লণ্ডনের পিকাডিলী সার্কাসের চাইতে মধ্যমগ্রামের দেশ-হিতৈষী কলোনীকে আজও সে বেশী ভালবাসে। মিস অ্যালেন, মিসেস চোপরা, মিস চৌধুরী, মিস রঙ্গনাথন, মিসেস যোশীর অনেক আকর্ষণের স্মৃতি ছাপিয়ে মনে পড়ে শুধু বৌদিকেই। আশ-পাশের অনেক মানুষের চাইতে অনেক বেশী মনে পড়ে দেশহিতৈষী কলোনীর অর্ধমৃত মানুষকে। ওয়াশিংটন, মস্কো, কায়রো, নিউইয়র্ক, লণ্ডনকে ভাল লেগেছে, কিন্তু দেশহিতৈষী কলোনীর মতো এদের সঙ্গে কোন প্রাণের টান অনুভব করে নি। ফরেন সার্ভিসের সহকর্মী মিত্তিরের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু রাখালদার শূন্য আসন পূর্ণ করতে পারে নি। তাইতো হোমলিভ পেলে একটি মুহূর্ত নষ্ট করে নি, ছুটে এসেছে কলকাতায়, মধ্যমগ্রামের দেশহিতৈষী কলোনীতে।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কো বদলী হবার সময় তিন মাসের হোমলিভে ছুটে এসেছিল কলকাতা। প্রায় সারা দেশহিতৈষী কলোনীর সবাই এসেছিলেন দমদম এয়ারপোর্টে। কাস্টমস এলাকার বাইরে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অন্যান্য সব প্যাসেঞ্জারের আগে বেরিয়ে এলো পরিমল। অনেকেই ফিস ফিস করে বলাবলি করেছিলেন, দেখছিস খোকনদার কি প্রেস্টিজ।

রাখালদা বলেছিলেন, ওরে বাবা, হাজার হলেও ডিপ্লোম্যাট। খোকনের মালপত্তর ছোঁবার সাহস কোন কাস্টমস অফিসারের নেই।

সবাই একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছিলেন।

পরে অবশ্য পরিমল বলেছিল, আমাদের মতো যাঁদের ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট থাকে তাঁদের সাধারণতঃ কাস্টমস কিছু বলে না। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই ডিপ্লোম্যাটরা এই সম্মান পান।

শুনে সবাই অবাক হয়েছিলেন। প্রথমে মা-বাবা ও রাখালদাকে প্রণাম করলেন। কলোনীর ছেলেমেয়েদের একটু আদর-টাদর করে চারপাশ তাকিয়ে নিলেন। বললেন, রাখালদা বৌদি আসেন নি?

রাখালদা একটু মুচকি হেসে বলেছিলেন, এসেছে কিন্তু ভেবেছে

হয়তো তুই ওকে চিনতে পারবি না বা চিনতে তোর প্রেস্টিজে বাধবে। তাই ঐদিকে লুকিয়ে আছে।

'বৌদির কি মাথাটা পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে,' এই কথা বলেই পরিমল ছুটে গিয়েছিল বৌদির কাছে।

প্রথমে একটু প্রাণভরে দেখেছিল তার বৌদিকে, একটু হেসেছিল। তারপর বলেছিল, আমার আজকাল ভীষণ অহঙ্কার হয়েছে। তুমি কোন্ সাহসে এয়ারপোর্টে এলে।

বৌদির মুখের 'পর দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তির হাসির ঢেউ খেলে গেল। বৌদি এবার একটু হাসলেন। 'তোমার তো অহঙ্কার করার কারণ আছে ঠাকুরপো।' দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আজ তুমি কত বড় অফিসার, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা কর। কত টাকা রোজগার কর ; সুতরাং আমার মতো একটা অতিসাধারণ মেয়ের পক্ষে তোমার কাছে আসতে সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক।'

'ব্যস ব্যস আর ঢং কোরো না, বাড়ী চল।'

বৌদি সেদিন মুখে এসব কথা বললেও মনে মনে অসম্ভব গর্ববোধ করতেন তাঁর ঠাকুরপোর জন্য। এই কলোনীতে তো এতগুলো বৌ আছে, কিন্তু কই ঠাকুরপো তো আমার মতো আর কাউকে ভালবাসে নি। আমিই তো ওর সব চাইতে প্রিয়, সব চাইতে নিকট ছিলাম। সেদিন দমদম এয়ারপোর্টে ঠাকুপোর ঐ ক'টি কথায় খুব খুশী হয়েছিলেন বৌদি। মনে মনে শান্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে যে পরিমল বোস ডিপ্লোম্যাট হয়েও তাঁর ঠাকুরপো আছে।

মস্ত বড় অফিসার হয়ে বিলেত আমেরিকা ঘুরে এসেও পরিমলের যে কোনই পরিবর্তন হয় নি, একথা বুঝতে দেশহিতৈষী কলোনীর একটি মানুষেরও কষ্ট হলো না। সেই ধুতি সেই গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে লেগে পড়েছিল কলোনীর কাজে।

প্রথম ক'দিন কি ভীষণ উত্তেজনা ও হৈ-চৈ করেই না কাটল! মা-বাবা, রাখালদা-বৌদি ও আরো কয়েকজনের জন্য অনেক জিনিষপত্র এনেছিল পরিমল। সে সব নিয়েও কম হৈ-চৈ হলো না। টেপ রেকর্ডারে

কথাবার্তা টেপ করিয়ে নিয়ে বাজিয়ে শোনালে উত্তেজনা প্রায় চরমে পৌঁছাল !

প্রফুল্লবাবু ও তাঁর স্ত্রী পুত্রের কল্যাণে কলোনীর সবাইকে মিষ্টি মুখ করালেন। জনে জনে আশীর্বাদ করলেন পরিমলকে।

রাখালদা পরের দিন নিউইয়র্কের ফিফ্‌থ্‌ এভিনিউর বিখ্যাত দোকান আলেকজাণ্ডারের টেরিলিন প্যাণ্ট, বুশ শার্ট পরে অফিস গেলেন। সি-সি-এস অফিসের প্রায় সবাই জানল, পরিমল বোস ছুটিতে বাড়ী এসেছে। বৌদি কিন্তু লজ্জায় ফ্রেঞ্চ শিফন শাড়াটা পরলেন না। বললেন, না ঠাকুরপো, এ শাড়ী পরে বেরুলে সবাই হাসবে।

একদিন পরিমল বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। সেদিন ঠিকই শিফন শাড়াটা পরেছিলেন। পরিমল জিজ্ঞাসা করেছিল, এ কি বৌদি সবাই হাসবে যে !

একটু হেসে বৌদি জবাব দিয়েছিল, ফরেন সার্ভিসের পরিমল বোসের সঙ্গে বেরুলে কেউ হাসবে না, বরং বলবে কি সিম্পল ! তাই না ঠাকুরপো ?

রিক্সা করে দমদম এয়ারপোর্টের মোড় অবধি এসে ট্যাক্সি ধরল পরিমল। তারপর সোজা ফেয়ারলি প্লেস বুকিং অফিসে। রাখালদা তো অবাক।

'কি ব্যাপার রে খোকন ?'

'কি আবার ব্যাপার। বৌদিকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি, তাই তোমাকে নিতে এলাম।'

রাখালদা বললেন, নারে আমার অনেক কাজ। তোরাই যা। আমি আর তুই রবিবার যাব।

'ঠাকুরপো, সি-সি-এস-এর জামাইকে অফিস ফাঁকি দিতে বলছ ? ফেয়ারলি প্লেসে কাজ করে কিভাবে আনফেয়ার হয় বল।'—বৌদি টিপ্পনী কাটলেন।

রাখালদা ঠাট্টা করে বললেন, আরেঃ তুমি ! এমন সেজেছ যে

চিনতেই পারছি না।

পরিমল অনেক পীড়াপীড়ি করল। রাখালদা কানে কানে ফিস-ফিস করে বললেন, এমন হঠাৎ কাজ-কর্ম ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না, তোরা আজকে যা। রবিবার আমরা তিনজনে একসঙ্গে যাব।

পরিমল বললো, ঠিক আছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমাদের রেলের ক্যান্টিনের ফিস ফ্রাই খাওয়াও।

রাখালদা ফিস ফ্রাই-এর অর্ডার দেবার পথে কানে কানে প্রায় সব সহকর্মীকে বললেন, ঐ হচ্ছে আমাদের খোকন। এখন বদলী হয়ে আমেরিকা থেকে রাশিয়া যাচ্ছে। বৌদিকে নিয়ে সিনেমা চলেছে।

প্রায় সবাই এক ঝলকে দেখে নিলেন পরিমলকে। কয়েকজন এসে আলাপও করেছিলেন, রাখালের কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি, তা বলবার নয় বলে।

সেদিন দুজনে সিনেমা দেখলেন, ঘুরলেন-ফিরলেন বেড়ালেন। রাত্রিতে বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বসে বসে অনেক কথা হলো দুজনে।

'জানো বৌদি, তোমার জন্য ভীষণ মন খারাপ করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ছুটে আসি।' একটু থেমে পরিমল বলে, অনেক মেয়ে দেখলাম, অনেকের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু কই তোমার মতো একটিও পেলাম না।

বৌদিও বলেছিলেন, তুমি তো তোমার দাদাকে ভালভাবেই জানো। উনি আমাকে ভালবাসেন। কিন্তু আমার মনের খোরাক জোগাবার দিকে তাঁর কোন নজর নেই। তাই তো তুমি চলে যাবার পর আমার বড় কষ্ট হয়।

ভূপেন বসু এভিনিউ পিছনে ফেলে ট্যাক্সি শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা ক্রশ করল। বৌদি আবার একটু বাইরে কি যেন দেখে নিলেন। বৌদি আবার বলেন, আজ কিন্তু আমার সব দুঃখ ঘুচে গেছে। তুমি যে এতবড় হয়েও, এতদেশ ঘুরে এসেও আমাকে ভুলে যাওনি, আমাকে যে ঠিক আগের মতনই ভালবাস, সেজন্য আমি খুব খুশি।

এমনি করে দেখতে দেখতে ছুটির দিনগুলি ফুরিয়ে আসে। পরিমল আবার একদিন দমদমের মাটি ছেড়ে উড়ে যায় আকাশে, চলে যায় মস্কো।

যে আকাশ-পথে পরিমল উড়ে গিয়েছিল, সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে রাখালদা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন পরিমল তাঁর আপন ভাই, দুজনে মিলে নতুন করে সোনার সংসার গড়ে তুলছেন।

রাত্রে রাখালদা ঘুমিয়ে পড়লে বৌদি পাশ ফিরে শুয়ে জানলার মধ্য দিয়ে শিউলি গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দূরের আকাশ দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেন নিজেকে। ঠাকুরপো তো আমার চাইতে দু-তিন বছরের বড়ই হবে। ওর সঙ্গেও তো আমার বিয়ে হতে পারত। আমিও ঐ আকাশ দিয়েই প্লেনে করে উড়ে যেতাম বিলেত, আমেরিকা, রাশিয়া ও আরো কত দেশ! কত সুখেই আমি থাকতাম! কত আদর, কত ভালবাসাই না পেতাম! কত বড় বড় লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতো, পরিচয় হতো! ঠাকুরপোর মতো আমাকে নিয়েও সারা কলোনীর সবাই মেতে উঠত।

ঐ একই আকাশের তলায় মস্কোয় নিঃসঙ্গ ডিপ্লোম্যাট পরিমল বোস স্বপ্ন দেখত, এই জীবনে যদি ঠিক আর একটা বৌদি পেতাম, তবে তাঁকে বিয়ে করে জীবনটাকে পূর্ণ করতাম। যাঁর সঙ্গে মনের এত মিল, যাঁর কাছে আমি আত্মসমর্পণ করে এত আনন্দ, এত তৃপ্তি পাই, তাঁকে যদি পেতাম এই জীবনে···

মুক্ত বিহঙ্গের মতো মন আরো কতদূর যেন ভেসে চলে যায়।

পরিমল আবার হোমলিভে আসে, আবার দমদমের ভীড় ঠেলে যায় বৌদির কাছে। আবার ক'টি দিন হাসিতে, খেলায়, আনন্দে দুজনের মন মেতে ওঠে। বৌদির গণ্ডীবদ্ধ জীবনে হঠাৎ জোয়ার আসে, পরিমলের সংযত জীবনে একটু যেন চঞ্চলতা আসে।

এরই ফাঁকে মা বিয়ের কথা বললে পরিমল বলে, বিলেত-আমেরিকায় গেলে ছেলেরা ভাল থাকে না। অযথা বিয়ে দিয়ে কেন একটা মেয়ের সর্বনাশ করবে বল?

'তুই আজকাল ভারী অসভ্য হচ্ছিস,' মা মৃদু ভর্ৎসনা করেন তাঁর ছেলেকে।

পরিমল আবার ঐ একই আকাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়। ঐ আকাশের দিকে তাকিয়েই আবার দুটি মন, প্রাণ ভেসে চলে যায় অচিন দেশে। একজন মধ্যপ্রাচ্যের প্রাণকেন্দ্র নীল নদীর পাড়ে কায়রোয়, আর একটি প্রাণ কলকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে দুটি প্রাণ একই স্বপ্ন দেখতে দেখতে মিলিত হয় ভূমধ্য মহাসাগরের পাড়ে কোনও এক দেশে। বৌদির সঙ্গে তার অনেক মিল পরিমল জানে, বৌদিও জানে ঠাকুরপোর মনের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল। কিন্তু দুজনের কেউই জানে না একই আকাশ প্রতিদিন মাঝরাতে তাঁদের দুজনকে হাতছানি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় স্বপ্নময় এক রাজ্যে।

শেষরাতের দিকে বৌদির চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসে। ঘুমের ঘোরে অচৈতন্য অবস্থায় রাখালদা বৌদিকে একটু নিবিড় করে কাছে টেনে নেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন বৌদির বেশ লাগে সে নিবিড় স্পর্শ।

পরিমলের মন মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করতে চায়, আবার মাঝে মাঝেই ভেঙ্গে পড়ে। বেড-সাইড টেবিলের ওপর থেকে বৌদির ফটোটা তুলে নেয়, অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কখন যে চোখের পাতা দুটো ভিজে ওঠে, তা টের পায় না। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে, বীথি! ইচ্ছা করে না আমার কাছে ছুটে আসতে? আদর করতে? ভালবাসতে? ইচ্ছে করে না—

হঠাৎ রাখালদার কথা মনে হয়। পরিমলের মাথাটা ঘুরে ওঠে।

তিন মাসের ছুটিতে আবার পরিমল এলো কলকাতা। দীর্ঘদিন পর দুর্গাপূজা দেখবে এবার। দেশহিতৈষী কলোনীর ছেলেরা মাতোয়ারা হয়ে উঠল আনন্দে। মা-বাবা, রাখালদা-বৌদি সবাই খুশি। পূজার এক মাস বাকী, কিন্তু তবুও একটি দিন নষ্ট করল না পরিমল। মেতে উঠল পূজার উদ্যোগ করতে। যশোর রোডের 'পর বিরাট ফেষ্টুন টাঙান হলো, দেশহিতৈষী কলোনী সার্বজনীন

দুর্গোৎসব। ব্যাপকভাবে উদ্যোগ আয়োজন হলো পূজার।

ভাদ্দুরে গোমড়ামুখো আকাশ হেসে উঠল, শরতের আকাশ হাসি-মুখে দেখা দিল। বৌদির শোবার ঘরের পাশের শিউলি গাছটা ফুলে ভরে উঠল, গন্ধে মাতোয়ারা করল বৌদির মন। দশভূজা মা দুর্গা এলেন তাঁর দরিদ্র সন্তানদের ঘরে।

নবমী পূজার দিন আরতি আরম্ভ হলে পূজা প্যাণ্ডেলেই মা বকাবকি শুরু করে দিলেন পরিমলকে। 'তুই কি আশ্চর্য ছেলে বল তো? এতদিন পর পূজায় বাড়ী এলি অথচ এতবার বলা সত্ত্বেও একটি বারের জন্যও নতুন জামা-কাপড়টা পরলি না?'

বাবা বললেন, মার পূজার এই শেষ—দিনে নিজের মাকে দুঃখ দিও না।

পাশ থেকে রাখালদা বললেন, ছিঃ খোকন! কেন এই সামান্য একটা ব্যাপারে মাসিমা-মেসোমশাইকে কষ্ট দিচ্ছ। যাও দৌড়ে গিয়ে নতুন কাপড় পরে এসো। আরতি শেষ হবার পর পরই তো আবার থিয়েটার শুরু করতে হবে।

বাধ্য হয়ে পরিমল বাড়ীর দিকে পা বাড়াল।

রাখালদাদের শিউলি গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে এসে পুকুর পাড়ে আসতেই হঠাৎ বৌদির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

'কি গো বৌদি, তুমি এখনও আরতি দেখতে যাও নি?'

'আরতির পর একেবারে থিয়েটার দেখে ফিরব বলে সব ঠিকঠাক করে বেরুতে বেরুতে দেরী হয়ে গেল।'

গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছিল পরিমলের মুখে। বৌদি এক ঝলক দেখে নেন। জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এখন প্যাণ্ডেল ছেড়ে এদিকে এলে?

মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি আসে পরিমলের। বলে, তোমাকে একটু একা পাব বলে।

বৌদির মুখে একটু দুষ্টু হাসি খেলে যায়। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পরিমল এগিয়ে যায় বৌদির কাছে। মুহূর্তের জন্য দুজনেই মৌন হয়।

পরিমল যেন কেমন করে তাকায় বৌদির দিকে, বৌদি তাঁর স্বপ্নালু দৃষ্টি দিয়ে দেখেন ঠাকুরপোকে। দুজনেরই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়েছিল একই সঙ্গে। হঠাৎ একটু হাওয়ায় মিষ্টি শিউলির গন্ধ ভেসে আসে। দুজনেই যেন মনে মনে মাতাল হয়ে ওঠে। এক টুকরো মেঘ ঢেকে দেয় শরতের চাঁদকে। সেই অন্ধকারে জ্বলে ওঠে দুজনের প্রাণের প্রদীপ। হারিয়ে যায় স্বপ্নরাজ্যের দেশে।

বৌদি একটু পা চালিয়ে যান প্যাণ্ডেলে। কিছুক্ষণ পরে নতুন কাপড়-জামা পরে পরিমলও ফিরে যায় প্যাণ্ডেলে। কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাখালদা আরতি করতে মত্ত, কলোনীর সবাই সে আরতি দেখতে মত্ত। মত্ত হয়নি পরিমল, হয়নি বৌদি। তাঁদের দুজনের সলজ্জ দৃষ্টি বার বারই মিলেছিল মাঝ পথে।

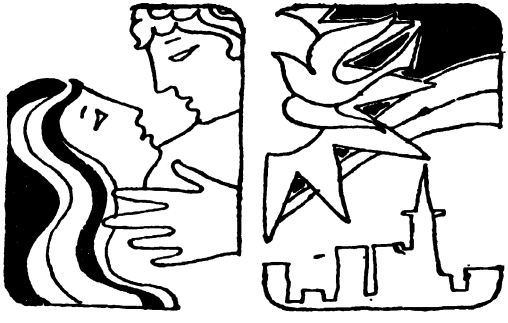

জাকার্তা থেকে বদলী হলাম পিকিং। মধ্যে তিন মাসের ছুটি। কিন্তু পিকিং দিল্লীর রাজনৈতিক মহাকাশে তখন কালবৈশাখীর ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। তিন মাসের হোমলিভ পাব কি না, সে বিষয়ে আমার বেশ সন্দেহ ছিল, কিন্তু তাই বলে পুরো ছুটিটাই বাতিল হবে, তা ভাবিনি। কলকাতায় কিছুদিন হৈ চৈ করে কাটাব বলে বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্রও দিয়েছিলাম। মাসিমাকেও লিখেছিলাম। বেশ খোশ মেজাজেই ছিলাম।

থার্ড সেক্রেটারী রঙ্গনাথন বিয়ে করে সবে জাকার্তা এসেছে।

এম্বাসীর আমরা সবাই ওদের দুজনের অনারে বোগরে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করলাম। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ্ অ্যাটাচি কাপুর চাঁদা তোলা শুরু করে দিল, প্রেস অ্যাটাচি মুখার্জী আর মিসেস মুখার্জী চিত্রাঙ্গদার সিলেকটেড্ সিনের রিহার্সাল আরম্ভ করে দিলেন। ভাইস-কন্সাল যোশী বোগরের সব ব্যবস্থার ভার নিল।

দু'সপ্তাহ প্রস্তুতির পর সেই শনিবার এলো। সকাল সাতটায় চানসেরার বিল্ডি থেকে আমাদের কনভয় রওনা হলো। কোন দুর্ঘটনার জন্য নয়, আনন্দের আতিশয্যে আধঘন্টার রাস্তা যেতে আড়াই ঘন্টা লাগল। পথে কনভয় থামিয়ে কাপুর ও জন চারেক ভাংড়া ডান্স দেখাল, রঙ্গনাথন ও মিসেস রঙ্গনাথনকে দিয়ে এক লাভ-সিনের শট তুলল সিন্হা তার মুভিতে এবং আরো অনেক কিছু হলো।

বোগরের ঐতিহাসিক বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস-কন্সাল যোশী যা খেল দেখাল, তা ভোলবার নয়। তিনজন স্টাফকে এয়ার-আর্মি-নেভাল এ-ডি-সি সাজিয়ে রিসিভ্ করল মিঃ ও মিসেস রঙ্গনাথনকে, একদল স্কাউট ছেলে-মেয়েদের দিয়ে গার্ড অব্ অনার প্রেজেন্ট করল, টেপরেকর্ডার বাজিয়ে মিলিটারী ব্যাণ্ডে জাতীয় সঙ্গীত শোনাল এবং সবশেষে নিজে মাথায় একটা গান্ধীটুপি চাপিয়ে ভারত সরকার ও ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা বক্তৃতাও দিল। জনচারেক সেকেণ্ড ও থার্ড সেক্রেটারী অভিজ্ঞ টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানদের মতো ছোটাছুটি করে অনুষ্ঠানটির মুভি তুলল।

দুপুরের ভোজনপর্বটাও বিচিত্র হলো। দক্ষিণ ভারতীয় মশালা দোসার সঙ্গে সম্বর এলো না, এলো বাঙালীদের মাছের ঝাল, পুরীর সঙ্গে এলো গুজরাটীদের ব্যাসনের ভাজা, পোলাও এলো সম্বরের সঙ্গে এবং এমনি মজাদার আরো অনেক কিছু। অপরাহ্নকালীন চায়ের পর শুরু হলো চিত্রাঙ্গদা। প্রথম দৃশ্য অভিনয় সবে শুরু হয়েছে এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সিংহল ও ইউ-এ-আর অ্যাম্বাসাডরদেয় নিয়ে আমাদের অ্যাম্বাসাডর হাজির। যোশী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনজন

এ-ডি-সি হাজির করল, স্কাউটদের আবার টেনে এনে লাইন করে দাঁড় করাল। আবার রিসেপ্‌শন, গার্ড অব্‌ অনার, আবার টেপ-রেকর্ডারে ন্যাশনাল অ্যানথেম বাজানো হলো। যোশী আবার গান্ধী-টুপি চাপিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে তিনজন রাষ্ট্রদূতকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানালেন।

চিত্রাঙ্গদা অভিনয় শেষ হলো। হঠাৎ কোথা থেকে অকস্মাৎ হাজির হলো পাকিস্তান অ্যাম্বাসীর দুজন সেকেণ্ড সেক্রেটারী মনসুর আলি আর রহমান।

মনসুর আলি গাইল একটা গজল, রহমান আবৃত্তি করে শোনাল কতকগুলি উর্দু 'শের'।

তিনজন রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে মিসেস রঙ্গনাথনকে একটা পোর্টেবল টেলিভিশন সেট প্রেজেণ্ট করলেন ইউ-এ-আর অ্যাম্বাসাডর, স্কাউটদের আপ্যায়নের আমন্ত্রণ জানালেন আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের অনারে সিংহলের রাষ্ট্রদূত একটা ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন উপস্থিত সবাইকে।

সূর্য অস্ত গেল। বোগরের মালভূমিতে বেশ আমেজি ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে সারাদিনের ক্লান্তি বিদায় নিল। আমাদের কনভয় আবার ফিরে এলো জাকার্তা।

পরের দিন সকালে অফিসে যেতেই রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠালেন।

'গুড মর্নিং স্যার।'

'মর্নিং।'

হাতে একটা রেডিও মেসেজ দিলেন!···ইনসট্রাক্ট ফার্স্ট সেক্রেটারী তাপস সেন প্রসিড পিকিং ডাইরেক্টলি স্টপ নো হোম-লিভ বাট ওয়ান উইকস্‌ প্রিপারেটরী লিভ গ্রানটেড।···কোথায় তিন মাসের ছুটিতে কলকাতায় আনন্দ করব, তা নয়তো, তার পরিবর্তে মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি!

অ্যাম্বাসাডর বললেন, 'আই অ্যাম স্যরি সেন। তুমি বলবার পর আমি নিজে ফরেন সেক্রেটারীকে একটা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিলাম,

কিন্তু তাতেও কিছু হলো না।'

একটু থামলেন। আবার বললেন, 'পিকিং গিয়ে নিজের কাজ-কর্ম গুছিয়ে নেবার পর ছুটি নিয়ে একবার কলকাতায় ঘুরে এসো।'

অ্যাম্বাসাডরকে আমি ধন্যবাদ জানালাম।

অ্যাম্বাসাডর বললেন, 'অনেক মিশনে অনেককে নিয়েই আমি কাজ করেছি, কিন্তু তোমার মতো সহকর্মী আমি বেশী পাইনি। ইন্‌ফ্যাক্ট তোমার মতো কলিগ্‌ পাবার জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ইন এনি কেস, যে-কোন প্রয়োজনে তুমি আমাকে মনে করলে আমি সুখী হবো। তাছাড়া সামনের বছর তো আমি নিজেই মিনিস্ট্রীতে ফিরে যাব, তখন নিঃসঙ্কোচে তুমি আমাকে তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা জানালে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করতে পারব।

আমি মাথা নিচু করে সব শুনলাম। আরেকবার রাষ্ট্রদূত চতুর্বেদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

দু'টি সপ্তাহ যেতে না যেতেই আমার বিদায় সংবর্ধনার পালা শুরু হলো। আমি ব্যাচিলার বলে সর্ব প্রথম সংবর্ধনা জানাল ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বাসী ব্যাচিলার্স ইণ্ডিয়ান-এর তরফ থেকে। ইউনিয়নের তরফ থেকে ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত শিল্পী রেজাদ মহম্মদের আঁকা একটা অপূর্ব সুন্দরী চীনা মেয়ের পেন্টিং আমাকে উপহার দেওয়া হলো। এই আশা নিয়ে ব্যাচিলার ইউনিয়ন আমাকে এই উপহার দিয়েছিল—এই চীনা সুন্দরী আমার কৌমার্যকে চীনে অটুট রাখতে অনুপ্রাণিত করবে। চমৎকার!

পরবর্তী অনুষ্ঠানে মেয়েরা আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। তারপর স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন, ডিপ্লোম্যাটিক স্টাফরা এবং সবশেষে অ্যাম্বাসাডর চতুর্বেদী বেশ জাঁকজমকভাবে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানালেন। ইন্দোনেশিয়ার ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার ছাড়াও এশিয়া আফ্রিকা গোষ্ঠীর জন পাঁচ-ছয় রাষ্ট্রদূত ও নানা দেশের কয়েক ডজন সিনিয়ার ডিপ্লোম্যাট এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

তারপর একদিন সকালে সত্যিই আমি জাকার্তার মাটি ছেড়ে

পাড়ি দিলাম সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুর ইণ্টার-কণ্টিনেণ্টাল হোটেল আগেই বুক করা ছিল। পারা লেবার এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের কমিশনের মিঃ রাও-এর সঙ্গে হোটেলে এসেই আবার বেরিয়ে পড়লাম বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা একদল মিলে গেলাম সিঙ্গাপুরের অতি খ্যাত নাইটক্লাব —সিভিউ হোটেলের 'চিকেন ইন'-এ। পরের দিন কিছু মার্কেটিং করলাম। ন্যাশনাল মিউজিয়মের ধার থেকে কিছু চামড়ার জিনিস কিনে হাই স্ট্রীট—অর্চার্ড স্ট্রীট থেকে কিছু জামা-কাপড় ও একটা ভাল জাপানী ট্রানজিসটার রেডিও কিনে হোটেলে ফিরলাম লাঞ্চের সময়। তারপর লাঞ্চ খেয়েই রওনা হলাম এয়ারপোর্ট। এলাম হংকং।

কাইতাক এয়ারপোর্টে আমার পুরনো সহকর্মী ইন্দ্রজিত সিং-এর হাতে কতকগুলি জরুরী সরকারী কাগজপত্র পেলাম। পিকিং যাবার আগে দিল্লী থেকে জয়েণ্ট সেক্রেটারী কতকগুলি কথা জানিয়েছেন। মাসিমারও একটা চিঠি এসেছিল ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে। মাসিমার চিঠিতে জানলাম লীনার ছেলে হয়েছে।

পরের দিন ভোরে উঠেই রওনা হলাম চীন-হংকং সীমান্তের দিকে। সীমান্ত পার হলাম। ওপারে গিয়ে ট্রেনে চড়ে গেলাম ক্যাণ্টন; তারপর প্লেনে পিকিং।

চারটি বছর প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত একটা অব্যক্ত চাপা উত্তেজনার মধ্যে কাটত আমাদের সবার। ছুটি তো দূরের কথা, একটি দিনের জন্যও বিশ্রাম করার অবকাশ পাইনি। প্রতিদিনই একটা না একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে কেটেছে পিকিং-এর দিনগুলি।

শেষে আমার পিকিংবাসের পালাও একদিন শেষ হলো। বদলী হলাম করাচী। দিল্লীতে আমার এক বন্ধু সেক্রেটারীকে লিখলাম, কি ব্যাপার? আমাকে এক ট্রাবল-স্পট থেকে আর এক ট্রাবল-স্পটে কেন বদলী করা হচ্ছে? উত্তর এলো, সাউথ ব্লকের সারা ফরেন

মিনিস্ট্রীতে নাকি কৃতী ডিপ্লোম্যাট বলে আমার খুব সুনাম এবং সেজন্যই জার্কাতা থেকে পিকিং, পিকিং থেকে করাচী।

তবে পিকিং থেকে করাচী যাবার পথে একমাসের ছুটি জুটেছিল আমার অদৃষ্টে! মাসিমার চিকিৎসার একটু সুব্যবস্থা করতে না করতেই আমার ছুটি শেষ হয়ে এলো। কয়েকদিন পরে রওনা হলাম দিল্লী। দিন চার-পাঁচ ফরেন মিনিস্ট্রীতে আলাপ-আলোচনা করার পর চলে গেলাম করাচী।

সরকারী কাজ-কর্মে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হলেও করাচীর দিনগুলো মোটামুটি ভালই কাটছিল। পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসে অনেক বাঙালী আছেন। পাকিস্তান রেডিওতেও বাঙালীর সংখ্যা কম নয়। এদের অনেকের সঙ্গেই বেশ একটা হৃদ্যতার সূত্র গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যাবেলায় মনসুর আলির বৈঠকখানায় গানের আসর বসত। মনসুরের ভাটিয়ালী, মিসেস খাতুনের রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আমাদের হাই কমিশনের মিঃ রায়ের মেয়ে বন্দনার অতুল-প্রসাদ-নজরুলের গান শেষ হতে না হতেই মনসুরের মা ডাক দিতেন, এসো বাবা, খাবার-দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওদের ওখানে সরষে-বাটা দিয়ে যে ইলিশমাছের ঝাল খেয়েছি, তা জীবনে ভুলব না। রবিবার দিন আড্ডা বসতো মিঃ রায়ের বাড়ি। শুরু হতো তেলেভাজা-চা দিয়ে, শেষ হতো বিয়ে বাড়ির মেনু দিয়ে।

বছর খানেক বাদে ছুটির আবেদন করলাম। আবেদন মঞ্জুর হলো। তিন মাসের ছুটিতে আমি কলকাতা গেলাম।

মাস দেড়েক বেশ কেটে গেল। খবরের কাগজের খবর পড়ে বেশ বুঝতে পারছিলাম, করাচীর হাওয়া বদলে গেছে। বেশ অনুমান করতে পারছিলাম মনসুর আলির বাড়ির সাপ্তাহিক গানের আসর বন্ধ হয়েছে, রবিবার মিঃ রায়ের ড্রইংরুমে আর আড্ডা জমছে না। তারপর একদিন কাগজে দেখলাম, পাকিস্তান সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য সরকারীভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। দু'দিন বাদেই দিল্লী থেকে জয়েন্ট সেক্রেটারীর নিমন্ত্রণপত্র পেলাম, তাড়াতাড়ি

দিল্লী এসো। ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের সদস্য হয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলে যেতে হবে।

একটি দিনের মধ্যেই কলকাতার পাট চুকিয়ে দিলাম। পরের দিন সকালের ফ্লাইটে গেলাম দিল্লী। এক সপ্তাহ ধরে আলাপ-আলোচনা শলা-পরামর্শের পর গেলাম করাচী। ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশন সোজা চলে গেল নিউইয়র্ক। ঠিক হয়েছিল করাচীতে কাগজপত্র ঠিকঠাক করেই আমিও সোজা নিউইয়র্ক যাব।

দিল্লীতে ঠিক হয়েছিল আমি দু'দিনের মধ্যে করাচীর কাজ শেষ করব এবং বুধবার সন্ধ্যার প্লেনে বম্বে গিয়ে রাত্রেই এয়ার ইণ্ডিয়া ফ্লাইটে লণ্ডন রওনা হব। কিন্তু করাচীর পরিস্থিতি এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল যে, রবিবার কেন, সোমবার-মঙ্গলবারের রিজার্ভেশনও বাতিল করতে হলো। শেষ পর্যন্ত বম্বে হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করতে বাধ্য হলাম। স্থির হলো বুধবার মাঝরাতে প্যান-আমেরিকান ফ্লাইটে লণ্ডন যাব এবং শুক্রবার সকালে এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইটে নিউইয়র্ক।

এয়ারপোর্টে এসে কাস্টমস পাশপোর্ট চেক করিয়ে আমাকে ট্রানজিট লাউঞ্জের একপাশে বসানো হলো। একটু দূরে একজন পুলিশ অফিসারকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট খেতে দেখলাম। বুঝতে কষ্ট হলো না, আমার প্রতি নজর রাখার জন্যই প্রভুর আবির্ভাব। করাচীর আগে প্যান-আমেরিকানের এই প্লেনটি কলকাতায় থেমেছিল। কিন্তু ট্রানজিট লাউঞ্জে একজনও কলকাতার প্যাসেঞ্জার দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, কলকাতার যাত্রীরা বিমান থেকে নামার অনুমতি পাননি।

প্লেনের ডিপারচার অ্যানাউন্সমেণ্ট হলে এয়ার লাইন্সের একজন গ্রাউণ্ডস্টাফ আমাকে সর্বাগ্রে প্লেনে যেতে বললেন। ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হলো না। সামনের সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে ঢুকে দেখলাম পূর্বের পুলিশ অফিসারটি আগে থেকেই আমাকে অভ্যর্থনা কবার জন্য সেখানে উপস্থিত।

কেবিনে আমি ছাড়া আর মাত্র দু'জন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। চীফ

স্টুয়ার্টকে বলে আমি আমার নির্দিষ্ট সীটটি ছেড়ে একেবারে পিছনের সারির ধারের সীটটিতে বসলাম।

কেমন যেন আনমনা হয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। নানা চিন্তায় টেরই পাইনি কখন প্লেন ছেড়েছে, কখন আরব সাগরের উপর দিয়ে বেইরুটের দিকে ভেসে চলেছে আমাদের বিমান। আবছা আলোয় হঠাৎ একটা শিশুকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আমার যেন সংবিৎ ফিরে এলো। কিছুক্ষণ শিশুটিকে আপন মনে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। আরও কিছু সময় কেটে গেল। তারপর আস্তে তুড়ি দিয়ে বাচ্চাটিকে ডাক দিলাম! রাত্রির নিস্তব্ধতায় আমার প্রায় নীরব নিমন্ত্রণে শিশুটির ঈষৎ চাঞ্চল্য বন্ধ হলো। একটু দ্বিধা, একটু সঙ্কোচে সে আমার থেকে একটু দূরে থমকে দাঁড়াল! কয়েক মিনিট দুজনেই দুজনকে দেখলাম। আরো দু'চার মিনিট কেটে গেল। আমি ধীরে একটু এগিয়ে গেলাম। ভাল করে দেখলাম। বেশ ভাল লাগল। মনে হলো পশ্চিম পাকিস্তানেরই হবে; তা নয়তো এত ফর্সা, এত সুন্দর হয় কি!'

অতি সন্তর্পণে আমি শিশুটির একটি হাত ধরলাম। প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমারে কিয়া নাম হ্যায় বেটা?'

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে মোটা মোটা বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

মিনিট খানেক বাদে আমি আর-একবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'বেটা তুমারা নাম বাতাও!'

কয়েক মুহূর্ত পরে ধীরে ধীরে শিশুটি আধো-আধো স্বরে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, 'আপনি কি বলছেন?'

এই ক'দিনে করাচী আমার মনটাকে তিক্ত করে দিয়েছিল। সিকিউরিটি কাউন্সিলের আগামী দিনগুলির চিন্তায় মন কম উদ্বিগ্ন ছিল না। মাঝরাতে প্লেনের মধ্যে এই শিশুটির কচি মুখে বাংলা কথা শুনে যেন একটা দমকা হাওয়ায় মনের মালিন্য সব ধুয়ে-মুছে গেল। হাসির রেখা ফুটে উঠল আমার মুখে।

হাত ধরে আদর করে কাছে টেনে নিলাম শিশুটিকে। জিজ্ঞাসা

করলাম, 'কি নাম তোমার ?'

উজ্জ্বল দুটি মিষ্টি কচি চোখের দৃষ্টি আমার সারা মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে বললো, 'আমার নাম স্বপন।'

একটি মুহূর্ত থেমে আমাকে আবার প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি ?'

স্বপন নামটা শুনে হঠাৎ অনেকদিন পর ভুলে-যাওয়া অতীতের একটা স্বপ্নের কথা মুহূর্তের জন্য আমার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে দিল।

চিন্তার অবকাশ পেলাম না। স্বপন আমার হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'বল না, তোমার কি নাম ?'

হাসি মুখে উত্তর দিলাম, 'আমার নাম তাপস।'

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে স্বপন ছুটে গেল টুরিস্ট ক্লাসের দিকে।

স্বপন চলে গেল, কিন্তু অতীত দিনের স্মৃতি স্বপ্নের মেঘ আমার মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে দিল। ভুলে গেলাম কাশ্মীর সমস্যা, আসন্ন সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশনের কথা ; ভুলে গেলাম আজকের আমাকে, ভুলে গেলাম ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী তাপস সেনকে।

···বাবা মারা যাবার পর কাকিমার কৃপায় তাপসের পক্ষে কাকার সংসারে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আর একটা দিনও নষ্ট করেনি। পাটনায় কাকা-কাকিমাকে প্রণাম করে চড়ে পড়ল ট্রেনে। চলে এলো কলকাতায় মাসিমার কাছে। পিতৃ-মাতৃহীন তাপসকে আপন সন্তানজ্ঞানে মাসিমা নিজের সংসারে ঠাঁই দিলেন।

ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করল তাপস। ভর্তি হল স্কটিশ চার্চে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুই টিউশনিও যোগাড় করে নিল নিজের খরচপত্র চালাবার জন্য। মাসিমা ও মেসোমশাই দুজনে আপত্তি করেছিলেন। তাপস বলেছিল, পরিশ্রম করে আয় করার মধ্যে একটা আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি আছে। তাছাড়া আজে বাজে সময় নষ্ট না করে দুটি ছাত্র পড়ালে ক্ষতি কি ? মাসিমা মেসোমশাই আর আপত্তি করেননি।

জনক রোড থেকে স্কটিশ চার্চে যেতে চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগে। দশটা নাগাত বাড়ি থেকে বেরিয়ে লেক মার্কেটে এসে ২বি বাস ধরে তাপস রোজ কলেজ যায়। আবার চারটে নাগাত রওনা হয়ে পৌনে পাঁচটার মধ্যে ফিরে আসে। ঐ সময় ২বি বাসে স্কটিশ বেথুনের অনেক ছেলেমেয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করে। বেশ কয়েক মাস পরে তাপস আবিষ্কার করল পরাশর রোড থেকে বেরিয়ে একটি মাত্র মেয়েই প্রায় নিত্যই ওই বাসে বেথুনে যায়, আসে। বছর খানেক পরে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে মুখে শুধু একটু হাসির রেখা ফোটাত। কিন্তু তার বেশী নয়।

আরও মাস ছয়েক বাদে একদিন দুজনে পাশাপাশি বসে কলেজ গিয়েছিল। তাপস ইচ্ছা করে লেডিস্ সীটে ওর পাশে বসেনি। পাশের সীটটা খালিই ছিল এবং কোন মহিলা যাত্রীও ছিলেন না।

ইশারায় আমন্ত্রণ পেয়েই তাপস পাশে বসেছিল। দুজনেরই মধ্যে প্রায় অজান্তে একটা সেতুবন্ধন রচনা হচ্ছিল। বাস-স্টপে এসে না দেখা হলে অদর্শনের অতৃপ্তি দুজনেই অনুভব করত।

প্রায় দু'বছর পর, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার মাত্র কিছুকাল আগে দুজনের মধ্যে প্রথম কথা হলো। তাপস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের টেস্ট কবে থেকে?'

'এই তো আগামী পনেরোই থেকে শুরু।' একটু থেমে পালটা প্রশ্ন এলো, 'আপনাদের?'

'সতেরোই, বুধবার থেকে।'

এমনি করে মন্থর গতিতে অত্যন্ত সংযতভাবে এগিয়ে চলেছিল দুটি জীবন। টেস্ট আরম্ভ হলো, শেষ হলো। একদিন ফাইন্যাল পরীক্ষাও আরম্ভ হলো, শেষ হলো। তাপস ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চেই বি-এ পড়া শুরু করল। ক্লাস আরম্ভ হবার পরই লেক মার্কেট বাস-স্টপে খুঁজেছিল সেই পরিচিতার মুখ, কিন্তু পায়নি। ভেবেছিল হয়তো আর কোনদিন তার দেখা পাবে না! হয়তো একটু হতাশ হয়েছিল, হয়তো চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়েছিল সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু

বিধাতাপুরুষের খামখেয়ালীর খেলা পূর্ণ করবার জন্য অকস্মাৎ আবার দুটি প্রাণের, দুটি মনের সাক্ষাৎ হয়েছিল ঐ লেক মার্কেট স্টপেই।

দীর্ঘদিনের অদর্শনের বেদনা বোধকরি দুটি প্রাণে একই সুরে, একই তালে, একই সময় বেজে উঠেছিল। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, 'আরে, আপনি যে!' দুজনেই হেসে ফেলেছিল, দুজনেই লজ্জা পেয়েছিল। বাস-স্টপের অন্যান্য যাত্রীদের চাপা অথচ বিশেষ অর্থমূলক হাসি দুজনকে আরো বেশী লজ্জিত করেছিল।

পাঁচই আগস্টও দুজনে কলেজে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেদিন সারা কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। কলেজের ফটক থেকে ছেলেমেয়েরা ফেরত গেল। ইতিমধ্যে খবর এলো শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় স্টেটবাসে আগুন লেগেছে, ইউনিভার্সিটির সামনে পুলিশ গুলী ছুঁড়েছে, বৌবাজারে টিয়ারগ্যাস ফাটছে। ব্রাহ্মণের রাগ ও খড়ের আগুনের মতো কলকাতা শহরটাও মাঝে মাঝেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সেদিনও এমনি করেই কলকাতা জ্বলে উঠেছিল।

হেদুয়ার কোণায় ছেলেমেয়েদের ভীড়ের মধ্যে আবার দুজনের দেখা।

'বাড়ি যাবেন না?'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'তবে চলুন না!'

'কিসে যাব বলুন? ট্রাম নেই, বাস নেই, ট্যাক্সি নেই, রিক্সা নেই, কি করে যাব?'

তাপসের কথায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল লীনার কপালে, উজ্জ্বল দুটো চোখ ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। দু-চার মিনিট দুজনেই চুপচাপ থাকার পর লীনা প্রস্তাব করল, 'চলুন, সার্কুলার রোডের দিকে যাই।'

'চলুন।'

সেই দিনটির কথা তাপস-লীনার পক্ষে জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। সার্কুলার রোডে এসে যে রিক্সাওয়ালা শিয়ালদ' পর্যন্ত যেতে রাজী

হয়েছিল, রাজাবাজারের মোড়ে পুলিসের গুলী দেখে সে রিক্সা ফেলে দৌড় মারল একটা দোকানের মধ্যে। লীনার হাত ধরে তাপসও আশ্রয় নিয়েছিল আর একটা দোকানের দোর-গোড়ায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর দুজনে আবার নেমেছিল কিন্তু এবার আর কপালে একটা রিক্সাও জুটল না। হাঁটতে হাঁটতে এলো শিয়ালদ'। আবহাওয়াটা খুব থমথমে হলেও কোন গোলাগুলি চলছিল না তখন। অতি সন্তর্পণে শিয়ালদ' পার হলো, পার হলো বৌবাজারের মোড়।

মৌলালীর কাছাকাছি আসতেই আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল সারাটা অঞ্চল। কিছু লোক পুলিশের গাড়িতে ইট-পাটকেল ছুঁড়তেই পুলিশের উত্তর এলো টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ে! দার্জিলিংয়ের মতো সারাটা রাস্তা টিয়ারগ্যাসের মেঘে ঢেকে ফেলল সারাটা অঞ্চল। ঐ অন্ধকারের মধ্যেই একটা টিয়ারগ্যাস শেল এসে পড়ল ওদের দুজনের কয়েক হাত দূরে। লীনা চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছিল তাপসকে। রুমাল দিয়ে লীনার চোখ দুটো চেপে ধরে তাপস লীনাকে নিয়ে পাশের কর্পোরেশনের ওয়ার্কশপে গিয়ে ভিক্ষা করে একটু জল যোগাড় করে লীনার চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিয়েছিল। রুমালটাও ভিজিয়ে নিয়েছিল।

কিছুক্ষণ বাদে সি-আই-টি-র নতুন রাস্তা ধরে আবার দুজনে হাঁটতে শুরু করেছিল। কিছুদূর চলার পর লীনা প্রশ্ন করল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত?'

'আপনার চাইতে কম।'

একটু থেমে আবার লীনা প্রশ্ন করে, 'একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন?'

'আপনার বুঝি খেতে ইচ্ছে করছে?'

লিণ্টন স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে একটা পানের দোকান খোলা পাওয়া গেল। দু-বোতল কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে দুজনে আবার চলা শুরু করল। পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে এসে লীনা প্রস্তাব করল, 'চলুন, একটু বিশ্রাম করি, আর যেন পারছি না।'

'চলুন।'

দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল হতে চলেছে। সূর্যের তেজে ভাঁটা

পড়তে শুরু করেছে। পাম গাছের ছায়ায় দুজনে অনেকক্ষণ বসে ছিল। নিজেদের সুখ-দুঃখ, মন প্রাণের কোন কথা সেদিন হয়নি, কথা হয়েছিল শুধু পড়াশোনার, কলেজের ক্লাসের, প্রফেসরদের।

অনেকক্ষণ পর তাপস প্রশ্ন করেছিল, 'আপনার বাবা মা নিশ্চয়ই আপনার জন্য খুব চিন্তা করছেন।'

'হ্যাঁ, তা একটু করছেন বৈকি!' একটু থেমে, একটু হেসে টিপ্পনী জুড়ল লীনা, 'হাজার হোক মেয়ে তো, তার ওপর বয়স হয়েছে!'

'তা তো বটেই।'

একটু পরে পালটা প্রশ্ন আসে, 'আপনার বাবা মাও নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছেন, তাই না?'

'না, তাঁরা চিন্তা করছেন না।'

'কেন?'

ঠোঁটটা কামড়ে, চোখ দুটোকে একটু নীচু করে তাপস উত্তর দিল, 'তাঁরা কেউই নেই।'

লীনা হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে, একটু উতলা হয়ে বলল, 'তাই নাকি?'

লীনা পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিল। তাপস শুধু বলেছিল, 'তাপস সেনের জীবন কাহিনী বলার মতো নয়। শুধু জেনে রাখুন সে মাসিমার বাড়ি থাকে, স্কটিশ চার্চে বি-এ পড়ে।' শেষে শুধু বলেছিল, 'আসুন না একদিন আমাদের বাড়ি, মাসিমা খুব খুশি হবেন।'

হাসিমুখে লীনা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আসব।'

দুদিন পরেই লীনা এসেছিল মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে। মাসিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আলাপ হয়েছিল, অনেক গল্পও হয়েছিল কিন্তু তাপসকে দেখল না। অনেকক্ষণ বাদে লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়ে যতটা সম্ভব সহজ হয়ে লীনা একবার জিজ্ঞাসাই করে ফেলল, তাপসবাবুকে দেখছি না তো মাসিমা!

'না মা, সে তো এখন বাড়িতে থাকে না, ছাত্র পড়াতে গেছে।' ঘাড় বেঁকিয়ে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন, 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসবে।'

তাপস ফিরে লীনাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। লীনা আর অপেক্ষা করেনি, হাত ঘড়ি দেখে বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি, এবার চলি।'

সিঁড়ি দিয়ে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল তাপস। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় লীনা বলেছিল, 'কাল সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাড়ি আসবেন।'

'কেন ?'

'মা বলেছেন।'

'কেন ?'

'ধন্যবাদ জানাবেন বলে।'

'কেন ?'

'সেদিন অত কষ্ট করে আমাকে নির্বিঘ্নে বাড়ি আসবার ব্যবস্থা করার জন্য—।'

'সন্ধ্যাবেলায় তো আমাকে ছাত্র পড়াতে হয় !'

'একদিন না হয় ছাত্র নাই পড়ালেন।'

তাপস গিয়েছিল, তবে একটু দেরী করে। চা খেয়ে একটু গল্প করে লীনার মাকে একটা প্রণাম করেই উঠে পড়েছিল !

শুধু লীনার নয়, তার মায়েরও বেশ লেগেছিল তাপসকে। কয়েক-দিনের মধ্যে লীনার মনে একটা আশ্চর্য বিপ্লব ঘটে গেল। চৈত্রের খরার পর যেমন হঠাৎ কালবৈশাখী এসে সব কিছু ওলট-পালট করে দেয়, সবার অলক্ষ্যে লীনার জীবনেও এমনি ভাবে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। ভালবাসল তাপসকে।

পরবর্তী আড়াইটা বছর স্বপ্নের মতো কেটে গেল। দুটি মন, দুটি প্রাণ মিশে একাকার হয়ে গেল। দুটি জীবন, দুটি সুর, দুটি ধারা একই ছন্দে, একই তালে, একই দিকে, একই উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল। জীবনের অর্থ বদলে গেল, বাঁচার আনন্দ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। দুটি স্বপ্নও মিশে এক হয়ে গেল। প্রত্যক্ষে মেলামেশা, অপ্রত্যক্ষে আত্ম-সমর্পণের পালা শেষ হলো।

আউটরাম ঘাটের ধার দিয়ে হেস্টিংসের দিকে এগোতে এগোতে লীনা প্রশ্ন করে, 'তোমার কি মনে হয় তোমার জীবনের সব অপূর্ণতা, সব প্রয়োজন, সব দাবি আমি মেটাতে পারব? পারব কি তোমাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করতে? তোমাকে সুখী করতে?'

পায়ে চলা বন্ধ হয়, কিন্তু মন উড়ে চলে যায় অনাগত ভবিষ্যতের-দিনগুলিতে।

তাপস বলে, 'নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস থাকলে নিশ্চয়ই পারবে।'

'কেন, আমার নিষ্ঠা সম্পর্কে তোমার মনে কি আজও সন্দেহ আছে?'

'না, তা নেই। তবে মানুষের মন তো! ক' বছর আগে যেমন তোমার এই নিষ্ঠা ছিল না, ক'বছর পরে হয়তো এই নিষ্ঠা কমতে পারে, বাড়তে পারে।'

তাপস কোন বিষয়েই বেশী কিছু আশা করে না। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সব বিষয়েই একটা সংযত ভাব আছে, তা লীনা ভাল ভাবেই জানে। তাই আর প্রশ্ন করে না।

মাসিমার মন-রাজ্যেও লীনার আধিপত্য বিস্তার হয়। কলেজ থেকে ফিরে সন্ধ্যা নাগাত একটিবার সে আসবেই মাসিমার খোঁজ নিতে। বাথরুম থেকে বেরুলে মাসিমাকে সিঁদুর পরিয়ে দিতে লীনার বড় ভাল লাগে। মনে মনে মাসিমারও ইচ্ছা করে লীনার সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুরের একটা টান দিতে, কিন্তু সে আশার অভিব্যক্তি দেন না। সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে লীনা প্রণাম করে মাসিমাকে, মাসিমা বুকের মধ্যে টেনে নেন লীনাকে।

সেবার শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে মাসিমা অসুস্থ হলে লীনা বিকালের দিকে রোজ রান্না করে গেছে। পরের দিন সকালের রান্না ফ্রিজে তুলে রেখেছে। মাসিমা আর ধৈর্য ধরতে পারেন না, 'কি বলব মা, তোমাকে কোনদিন বরণ করে ঘরে তুলতে পারব কি না জানি না, কিন্তু তার আগেই তুমি একে একে সব দায়িত্ব তুলে নিতে শুরু করলে!'

লীনা কোন উত্তর দেয় না। হরলিকস্ আনার তাগিদে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।……

আজ করাচী থেকে বেইরুটের পথে তাপসের মনে পড়ে সে-সব দিনের স্মৃতি। সে-সব দিনের পর মনের মধ্যে আরো অনেক দিনের স্মৃতি জমেছে, কিন্তু তবুও লীনার স্মৃতি অম্লান হয়ে রয়েছে তার মনে। মনে পড়ে জন্মদিনের কথা। খুব ভোরবেলায় লীনা এসে চুরি করে একটা প্রণাম করে পালিয়ে যেত। বিকালের দিকে সরকারীভাবে এসে কিছু উপহার দিত। আর? আর শোনাত গান।

মনে পড়ছে আরো অনেক দিনের কথা।

'…জানো তাপস, আমার প্রথম ছেলে হলে তার কি নাম রাখব?'

'না।'

'স্বপন।'

তাপস বলে, 'মেয়ে হলে?'

'ছবি।'

'এই দুটো নাম বুঝি তোমার খুব পছন্দ?'

লীনা বলেছিল, 'আমার জীবনের স্বপ্ন সার্থক করে যে ছেলে হবে, সে হবে আমার স্বপন। আর যে মেয়ে আমাদের আগামী দিনের ছবি বাস্তব করে দেখা দেবে, তার নাম হবে ছবি।…'

কাঁচের জানালা দিয়ে দূরের আকাশের মিটমিট করা তারাগুলো দেখতে দেখতে নিজের জীবন আকাশের ঐশ্বর্যে ভরা দিনগুলির স্মৃতি মিটমিট করে জ্বলে উঠল। জনক রোডের জীবনে ঐ তারা দূরে ছিল না। আর আজ? তারা দূরে বহুদূরে চলে গেছে। ঐ আকাশ, ঐ তারা হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়, কিন্তু হাতের নাগালের বাইরে।

আরো মনে পড়ে। মনে পড়ে শেষ অধ্যায়ের কথা। সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

মাসিমার প্রস্তাব শুনে লীনার বাবা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'একটা অর্ডিনারী বি-এ পাস করা ছেলের সঙ্গে কি এই মেয়ের বিয়ে হতে পারে?'

লীনার দাদা বারান্দায় দাঁড়িয়ে টিপ্পনী কেটেছিল, 'বলিহারি ছেলে রে বাবা! বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে প্রেম করে বিয়ে করতে চায়।'

মাসিমা অনেক বুঝিয়েছিলেন, তাপস সাধারণ ছেলে নয়, সে একদিন দশ জনের একজন হবেই।

শুধু শূন্যহাতে নয়, অজস্র অপমানের বোঝা নিয়ে মাসিমা ফিরে এসেছিলেন।

লীনা কেঁদেছিল, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছিল, কিন্তু নিজের মনের কথা, প্রাণের ইচ্ছা জানাতে পারেনি লজ্জায়, সঙ্কোচে। সংস্কার তার কণ্ঠরোধ করেছিল। আরো অসংখ্য প্রেমের কাহিনীর মতো এদের কাহিনীও এইখানেই শেষ হলো।

যৌবনে সব বাঙালী মেয়েই প্রেমে পড়ে। যে বাঙালী মেয়ে বলে যৌবনে সে প্রেমে পড়েনি, সে হয় মিথ্যাবাদিনী, নয় তো মানসিক বিকারগ্রস্ত। দেহের মধ্যে নতুন জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের রাজ্যে নতুন পলি-মাটি পড়ে সে উর্বর হয়, ফুল ফোটে, ফসল ধরে। প্রেমের ফসল। ছোটবেলায় মেয়েরা পুতুল খেলা করে। বর সাজায়, বৌ সাজায়। তাদের বিয়ে দেয়, নেমন্তন্ন খাওয়ায়। পুতুলকে ছেলে সাজায়, আদর করে, কোলে নিয়ে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ায়। আবার ঝিনুক-বাটি নিয়ে দুধ খাওয়ায়, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করে, ওষুধ খাওয়ায়। খেলতে খেলতেই মেয়েরা হঠাৎ একদিন বড় হয়, তাদের অঙ্গে অঙ্গে যৌবন দেখা দেয়, দেহের নেশায় মাতাল হয়। পুতুল খেলা আর ভাল লাগে না। এবার মানুষ নিয়ে খেলা শুরু হয়। মেয়েরা খেলতে খেলতে শেখে, শেখে আগামী দিনগুলির জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের মিশেয়ে দিতে।

লীনা পুতুল খেলার মতো তাপসের সঙ্গে খেলা করেনি। আত্মসমর্পণ করেছিল সে। তাপসের ভালবাসার ঐশ্বর্যে সে মন ভরিয়ে তুলেছিল, কিন্তু আর এগুতে পারেনি। নিজে মর্মে মর্মে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছে, কিন্তু একটি বারের জন্যও মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেনি তার জীবনের চরম কাহিনী। মনে হয়েছে, একটি একটি করে বুকের পাঁজরা-

গুলো ভেঙে যাচ্ছে, তবুও পারেনি বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, দাদার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

তাপস আবার একদিন পাটনা ফিরে এম-এ পড়তে শুরু করল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে ফরেন সার্ভিসে ঢুকল। একদিনের জন্য কলকাতা এসে মাসিমাকে প্রণাম করে চলে গেল জেনেভা। জীবনে আর পিছনে তাকায়নি। তাপস কলকাতা ছাড়ার পরই লীনার বিয়ে হয়েছিল, মাসিমা নিমন্ত্রিতা হয়েছিলেন। তাপস সে-খবর পেয়েছিল। বিয়ের পরও মাসিমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত লীনা। কলকাতায় এলে দেখা করত। তাপস তাও জানত।

…আজ হঠাৎ এই প্লেনের মধ্যে ঐ ছোট্ট স্বপনকে দেখে মনে পড়ল সমস্ত স্মৃতি। ইচ্ছা করল একটি বারের জন্য স্বপনকে ডেকে এনে আদর করি। কিন্তু প্লেনের সবাই এখন ঘুমে কাতর। টুরিস্ট ক্লাসে উঁকি দিয়ে দেখলাম দু'জন জাপানী ভদ্রলোক রিডিং-লাইট জ্বেলে বই পড়ছেন, আর সবাই ঘুমিয়ে আছেন। ভারতীয় যাত্রীদের কাছে এখন শেষরাত্তির হলেও, জাপানীদের ঘড়িতে এখন দুপুর। করাচী ছাড়ার পরই তাঁরা ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন, বেইরুটের পরই লাঞ্চ খাবেন।

নিজের সীটে বসে আর-একবার বাইরের আকাশটা দেখে নিলাম। একটা সিগারেটও ধরালাম। দু-তিন মিনিট বাদেই সারা প্লেনে আলো জ্বলে উঠল। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম। বুঝলাম বেইরুট এসে গেছি। ক'মিনিট বাদে এয়ার-হোস্টেস জানাল, আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বেইরুটে পৌঁছব। যাত্রীরা যেন ধূমপান বন্ধ করে সীট-বেল্ট বেঁধে নেন। এয়ার-হোস্টেস আরো জানাল যে, বেইরুট থেকে নতুন বৈমানিক ও কর্মীরা বিমানের ভার নেবেন।

প্লেন বেইরুটে পৌঁছল। আমরা তিনজন প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বাসে উঠে টার্মিনাল বিল্ডিং গেলাম। টুরিস্ট ক্লাসের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মেয়ে-পুরুষ যাত্রী আর

একটা বাসে দু-এক মিনিট বাদেই টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে এলেন। সবে একটা সিগারেট ধরিয়ে এলিভেটরের দিকে দু-পা বাড়িয়েছি, এমন সময় ছুটে এসে স্বপন আমার হাতটা ধরে বললে, 'আমি স্বপন।'

টুক করে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে আমি বললাম, 'তুমি বুঝি স্বপন?'

গাল দুটো ফুলিয়ে চোখ দুটো টেনে টেনে বললো, 'আমিই তো স্বপন।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্বপন, তোমার বাবা-মা কোথায়?'

'আমার বাবা তো লণ্ডনে, তুমি জানো না?'

'না তো।'

'তুমি আমার মাকে দেখেছ?'

'না তো।'

স্বপন প্রায় হুড়মুড় করে আমার কোল থেকে নেমে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এস না আমার মাকে দেখবে।'

স্বপন আমার বাধা মানল না, টানতে টানতে হাজির করল তার মা-র কাছে। স্বপন বলল, 'এই তো আমার মা।'

আমি তো প্রায় পাথরের মতো হয়ে কোন মতে উত্তর দিলাম, 'তাই বুঝি?'

লীনা বলল, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'কেমন আছ?'

'খুব ভাল।'

একটু থেমে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি, 'তুমি কেমন আছ?'

'আমিও খুব ভাল আছি।'

'বেশ তো।'

দুজনেই দুজনকে একবার প্রাণ ভরে দেখে নিলাম।

'তোমার শরীর তো খারাপ হয়ে গেছে,' আমি বললাম।

'না, না, শরীর ঠিকই আছে। তোমার দেখার ভুল।'

'তাই নাকি ?'

লীনা হেসে মাথা নীচু করল।

দু-এক মিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। হঠাৎ স্বপন আমাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার মা-র গান শুনেছ ?'

এবার আমিও হেসে ফেললাম। স্বপনের গাল টিপে একটু আদর করে বললাম, 'বল না তোমার মাকে একটা গান শোনাতে।'

দু'হাত দিয়ে স্বপন মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'একটা গান কর না মা।'

'না বাবা, এখানে গান করে না,' লীনা উত্তর দেয়।

আর সব প্যাসেঞ্জাররা উপরে লাউঞ্জে অথবা ডিউটি-ফ্রি শপে চলে গিয়েছিলেন। আমিও লীনা আর স্বপনকে নিয়ে উপরে গেলাম। লেবাননের মরুপ্রান্তরের উষ্ণ হাওয়ার বেইরুট এয়ারপোর্টের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে প্রবেশের অনুমতি নেই। সেখানে কৃত্রিম ঠাণ্ডা হাওয়ার রাজত্ব ; কিন্তু তবুও লীনার সান্নিধ্যে বিচিত্র অনুভূতিতে আমার গলা-বুক শুকিয়ে এলো। একটা চাপা উত্তেজনায় শরীরটা কেমন করে উঠল। 'আয় আয় চাঁদ আয়' মুখে বলা যায়, কিন্তু সত্যি সত্যিই যদি চাঁদ এসে হাজির হয়, তাহলে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু ঘটতে পারে। সারা প্লেনে লীনাকে স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা ভেবেছি, তার প্রতিটি স্মৃতি রোমন্থন করেছি। না-পাওয়ার বেদনার মধ্যেও একটু যেন সুখের, একটু যেন তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই স্বপ্নের লীনা, স্মৃতির লীনা, কাহিনীর লীনাকে আজ দীর্ঘদিন বাদে পাশে পেয়ে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিল। বাইরে তার কোন প্রকাশ হতে দিলাম না, কিন্তু নিজে ভিতরে ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করতে লাগলাম।

স্বপনকে চকোলেট কিনে দু'বোতল কোল্ড ড্রিংক নিলাম, একটা বোতল লীনাকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই নাও। আর কি খাবে ?'

'কিছু না। তুমি কিছু খাবে ?'

'না।'

'খাও না কিছু। আমি খাওয়াচ্ছি।'

একটু চুপ করে উত্তর দিলাম, 'তুমি আদর করে, যত্ন করে, ভালবেসে খাওয়াবে, সে সৌভাগ্য করে তো আমি জন্মাইনি। সেজন্য কয়েকটা মুহূর্তের জন্য সে আনন্দ, সে সৌভাগ্য, সে তৃপ্তিভোগ করে লাভ কি?'

লীনা চুপ করে মাথাটা নীচু করল।

একটু পরে স্বপনের হাত ধরে ডিউটি-ফ্রি শপিং সেণ্টারে ঢুকলাম। বাঁদিকে জুয়েলার্সের দোকানের সামনে এসে হঠাৎ লীনার হাতটা চেপে ধরে বললাম, 'একটা অনুরোধ রাখবে?'

'কি অনুরোধ?'

'আজ বুঝি কৈফিয়ৎ তলব না করে আমার অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়?'

'না, ঠিক তা নয় তবে...'

'তবে আবার কি?'

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে লীনা কি যেন মনে একটা ফন্দী আঁটল। বলল, 'দুটি শর্তে তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি।'

'শুনি কি শর্ত।'

'প্রথম কথা আমি যা দেব, তোমায় খেতে হবে, আর দ্বিতীয়তঃ প্লেনে আমাদের কাছে বসবে।'

দুঃখের মধ্যেও একটু না হেসে পারলাম না। বললাম, 'তথাস্তু।'

তারপর জুয়েলার্স সপে ঢুকে আঠারো পাউণ্ড দিয়ে বেশ একটা পছন্দসই সুইস ঘড়ি কিনে নিজে লীনার হাতে পরিয়ে দিলাম। লীনা কোন প্রতিবাদ, কোন মন্তব্য জানাল না, শুধু স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

শপিং সেণ্টার থেকে আবার স্ন্যাক বারে ফিরে লীনার শর্ত পূরণ করে একপেট খেলাম। দুজনে দু'কাপ কফিও নিলাম।

একটু পরেই অ্যানাউন্সমেণ্ট হলো রোম, জেনিভা, লণ্ডন, নিউ ইয়র্কগামী প্যান-আমেরিকানের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে। যাত্রারম্ভের জন্য প্লেন প্রস্তুত। আমরা নীচে গেলাম। দু'দরজা দিয়ে দুদিক দিয়ে

প্লেনে চড়লাম। চীফ স্টুয়ার্টকে ডাক দিয়ে অনুরোধ করলাম, 'আমার এক আত্মীয়া মিসেস সরকার ও মাস্টার সরকার টুরিস্ট ক্লাসে আছেন। আমি কি তাঁদের পাশে বসতে পারি?'

প্যাসেঞ্জার-চার্টটা দেখে চীফ স্টুয়ার্ট উত্তর দিল, 'উইথ প্লেজার সার।'

ফার্স্ট ক্লাস কেবিন থেকে বেরিয়ে আমি লীনাদের পাশে বসলাম। সীট-বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে লীনা টিপ্পনী কাটল, 'আমি ভাবলাম ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে ঢোকার পর হয়তো আমাকে ভুলে গেলে।'

'ভুলতে পারলে হয়তো ভালই হতো। যদি নিজের সমস্ত অতীত স্মৃতি মুছে ফেলে সাধারণ ডিপ্লোম্যাটদের মতো হুইস্কির গেলাসে ডুব দিয়ে সর্বদেশের যুবতীদের উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারতাম, তবে হয়তো বুকের ভেতরটা এমন জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতো না।

পূর্ব দিগন্ত থেকে সূর্যের তাড়া খেয়ে রাত্রির বুক চিরে প্লেনটা ছুটে চলেছিল রোমের দিকে। অফুরন্ত রাত্রির অন্ধকারের আমেজে যাত্রীরা কম্বল জড়িয়ে তখনও ঘুমোচ্ছেন। অনেকক্ষণ জেগে থাকার পর অনেকক্ষণ বসে বসে কাটাবার পর স্বপনও ঘুমিয়ে পড়ল। তিনটি সীটের মাঝের দুটি হাতল তুলে দেওয়া হলো। জানালার দিকের সীটে স্বপনকে শুইয়ে লীনা আমার পাশ ঘেঁসে বসল। আমি বললাম, 'এত কাছে, এত নিবিড় হয়ে কেন?'

লীনা একটিবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবনে তো তোমাকে পেলাম না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য একটু কাছে বসছি, তাতেও তোমার আপত্তি?' একটু থেমে বলল, 'জীবনে তো অনেক ইচ্ছাই পূর্ণ হলো না। ভগবান যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে তোমাকে এই রাত্রিটুকুর জন্য পাইয়ে দিয়েছেন, তখন এই আনন্দ থেকে, এই সৌভাগ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। লীনা আস্তে আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে একটু কাত হলো।

বেশ লাগলো। হঠাৎ যেন মনে হলো আমি রাজা হয়েছি, মনে

হলো, আমি যেন সব চাইতে সুখী লোক। মনে হলো, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাণীকে নিয়ে চলেছি দেশ-দেশান্তর দেখতে।

কখন যে লীনার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছি, তা নিজেও টের পাইনি। কিছুক্ষণ পর লীনা আমার আর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলে উপলব্ধি করলাম, দুটি হাতে দুটি প্রাণ আজ কত নিশ্চিন্তে, কত নির্ভয়ে, কত সহজে নির্ভরশীল।

হঠাৎ এয়ার-হোস্টেস এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, ইউ উইল হ্যাভ কফি অর টি?'

'কফি!'

'হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ওয়াইফ, স্যার?'

এয়ার-হোস্টেসের কথা শুনে চমকে উঠলাম। কে যেন আমার কণ্ঠস্বর রোধ করে ধরল, আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

একটি মুহূর্ত নষ্ট না করে লীনা উত্তর দিল, 'ক্যান আই ডিফার ফ্রম মাই হাসব্যাণ্ড?'

একগাল হাসি হেসে এয়ার-হোস্টেসটি বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।'

বিদায় নেবার আগে এয়ার-হোস্টেস এ-কথাও জানিয়ে গেল, 'আপনাদের ছেলের ঘুম ভাঙলে আমাকে জানাবেন, আমি তার খাবার দিয়ে যাব।'

এবারেও লীনা উত্তর দিল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এবার আমার কণ্ঠস্বর ফিরে এলো। লীনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ কি করলে?'

নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, 'কি আর করলাম? আমাকে-তোমাকে-স্বপনকে পাশাপাশি দেখে এয়ার-হোস্টেসের পক্ষে কি অন্য কিছু ভাবা সম্ভব?'

ভেবে দেখলাম সত্যিই তো। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি তো সত্যি কথা বলতে পারতে?'

'আমি কেন তর্ক করব বল? দুনিয়াতে যে স্বীকৃতি আমাকে কেউ দেয়নি, সেই স্বীকৃতি আজ এই অপরিচিতা এয়ার-হোস্টেসের কাছ

থেকে পেলাম। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ।' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জীবনে কোনদিন ভুলব না এই এয়ার-হোস্টেসকে।'

একটু থামল। আমার চিবুক ধরে আমার মুখটাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে লীনা প্রশ্ন করল, 'এয়ার-হোস্টেসের কথা তোমার ভাল লাগেনি? পারবে তুমি ওর এই কথা ভুলতে?'

এমনি মিষ্টি আমেজ নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্যান-আমেরিকানের পক্ষীরাজ এলো রোম, এলো জেনিভা। এলো লণ্ডন।

প্লেন থেকে বেরুবার আগে লীনাকে ধন্যবাদ জানালাম। আমাকে অপ্রত্যাশিত মর্যাদা অভাবনীয় স্বীকৃতি দেবার জন্য। উপদেশ দিলাম, 'সুখে থেকো, সাবধানে থেকো।' আশ্বাস দিলাম, 'স্বামী পুত্র বা তোমার যে-কোন প্রয়োজনে যদি কোনদিন স্মরণ কর, তবে বুঝব আমার কৌমার্যের এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি।'

স্বপনকে কোলে টেনে নিয়ে অনেক আদর করলাম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

এক ফাঁকে হঠাৎ লীনা আমাকে প্রণাম করতে চমকে উঠলাম। আমি হাত তুলে আশীর্বাদ করার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছিলাম। লীনার চোখের জলটা পর্যন্ত মুছিয়ে দিতে পারলাম না। আমার চোখের দৃষ্টিটাও ঝাপসা হয়ে উঠল।

লীনার কেবিন ব্যাগ ও আরো দুটো-তিনটে ছোটখাট জিনিসপত্র এক হাতে ও অন্য হাতে আমার ফেলট্ ওভারকোট ও ব্রীফ-কেস তুলে নিলাম। আমার পিছন পিছন স্বপনের হাত ধরে লীনা নেমে এলো।

তিন নম্বর ওসানিক বিল্ডিংয়ে হেলথ্ কাউন্টারের দিকে এগোতেই লীনার স্বামী কাঁচে-ঘেরা উপরের ভিজিটার্স গ্যালারি থেকে হাত নাড়লেন। স্বপন চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'ঐ যে আমার বাবা।' স্বামীর দিকে তাকিয়ে লীনা শুধু একটু শুকনো হাসি হাসল।

আমি ওদের নিয়ে হেলথ্ কাউন্টার থেকে পাশপোর্ট কাউন্টার হয়ে কাস্টমস কাউন্টারে এলাম। আমাদের লণ্ডন হাই কমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী আমার বন্ধু মিঃ চারী আগে থেকেই কাস্টমস কাউন্টারে

অপেক্ষা করছিলেন। হাই কমিশনের আরো দু'জন স্টাফ এসেছিলেন আমার জন্য। তাঁরা আমার মালপত্র নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। আমার অনুরোধে লীনাদের মালপত্রও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই দেখে নিলেন কাস্টমস-এর একজন অফিসার। অফিসারটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সবাই বাইরে এলাম।

বাইরের ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমি ওভারকোট পরে মাথায় ফেলট্ চাপিয়ে নিলাম। স্বপন ছুটে গিয়ে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরল। খুব নরম গলায় লীনা পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি হচ্ছেন মিঃ তাপস সেন। করাচী ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে ফার্স্ট সেক্রেটারী এবং এখন চলেছেন ইউনাইটেড নেশনস্ এ।' একটু থেমে বলল, 'প্লেনে পরিচয় হলো তোমার ছেলের দৌলতে। শুধু তাই নয়, তোমার ছেলের অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করেছেন, অনেক খামখেয়াল চরিতার্থ করেছেন এবং সর্বোপরি পথ দেখিয়ে মালপত্র টেনে এনে অশেষ উপকার করেছেন।'

এরপর স্বামীর দিকে ফিরে শুধু বলল, 'ইনি আমার স্বামী মিঃ সরকার।'

আমি হাতজোড় করে মিঃ সরকারকে নমস্কার করলাম। বললাম, 'আপনার স্ত্রী যে এত মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তাতো ভাবিনি। আমার সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিলেন তা একটুও সত্যি নয়।' একটু ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বললাম, 'দুনিয়াতে আমি বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ। তাই স্বপন ও আপনার স্ত্রীর অশেষ কৃপায় কিছু সময়ের জন্য অন্তত নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। সেজন্য আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।'

স্বপনকে আর একটি বারের জন্য কোলে তুলে নিয়ে আদর করলাম। বললাম, 'কই, তুমি তো তোমার মা'র গান শোনালে না?'

স্বপন বলল, 'মা, গাও না একটা গান।'

আমরা সবাই না হেসে পারলাম না। মিঃ সরকারকে বললাম, 'বেশ ছেলেটি আপনার। ইচ্ছা করে চুরি করে পালাই।'

মিঃ সরকার একটু হাসলেন।

আমি আর একবার মিঃ সরকারকে নমস্কার করলাম, স্বপনকে আদর করলাম এবং সব শেষে লীনাকে বললাম, 'আপনাকে ও আপনার ছেলেকে হয়তো অনেকদিন মনে রাখব, ক্ষমা করবেন।'

আমি আর কালবিলম্ব না করে বিদায় নিয়ে মিঃ চারীর সঙ্গে জনাকীর্ণ লণ্ডনের রাজপথে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।...

তাপস বিদায় নেবার পরও কয়েকটা মুহূর্ত লীনা নিশ্চয় পাথরের মতো তারই পথের দিকে চেয়েছিল।

মিঃ সরকার বললেন, 'তুমি ওঁর পুরো ঠিকানাটা রেখেছ?'

লীনা শুধু মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

'সেকি! অতবড় একটা ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে আলাপ হলো অথচ তাঁর ঠিকানাটা রাখলে না?'

লীনা শুধু বলল, 'ভুলে গেছি।'

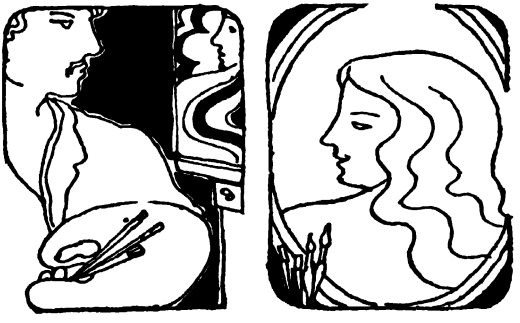

এক

ছোট ছোট মেঘের টুকরোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদ আবার লুকিয়ে পড়ল। রত্না একটু আড়াল দিয়ে চোখের জল মুছে নিল। আমার সান্ত্বনা জানাবার কোন ভাষা ছিল না। তাছাড়া গলা দিয়ে যেন কথাও বেরুতে চাইল না। ইচ্ছা করছিল রত্নার চোখের

জল মুছিয়ে দিই, তাকে অনেক কিছু বলে একটু সান্ত্বনা জানাই! কিছুই পারলাম না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইলাম।

কতক্ষণ যে দুজনে এমনি করে নিশ্চল দুটি প্রাণহীন পাথরের মূর্তির মতো বসেছিলাম, তা মনে নেই। মনে আছে, রত্নার মা রত্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওদের হাউস বোটে।

আমার হাউস বোটের ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে শিকারায় চড়বার সময় শাড়ীর আঁচলটা একটু টেনেভাল করে গায়ে জড়াতে জড়াতে রত্না শুধু বলেছিল, চলি দাদা, কাল সকালে আবার আসব।

আমি তারও কোন জবাব দিতে পারিনি। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম বলেও মনে হয় না।.....

...অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর গিয়েছিলাম। বহুদিন পরে, বহু চেষ্টা করে ক'দিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিলাম সাংবাদিক জীবনের নিত্যকর্ম পদ্ধতি থেকে। ভেবেছিলাম, ডাল হ্রদের জলে হাউস বোটে ভাসতে ভাসতে একটু তাজা করে নেব নিজের দেহ আর মনকে। বায়ুগ্রস্থ আমেরিকান টুরিষ্টদের মতো উল্কার বেগে ঘুরে বেড়াবার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। গুলমার্গ-পহলগাও দেখারও কোন আগ্রহ ছিল না। অন্যান্য বাঙ্গালী টুরিষ্টদের মতো বক্স-ক্যামেরা হাতে নিয়ে শালিমার গার্ডেন দেখতেও আমি চাইনি। তাইতো তারিক-এর 'নিউ মডার্ণ প্যারিস' হাউস বোটে এসেই বলেছিলাম, দুটো টাকা বেশী নিও কিন্তু নতুন খদ্দের এনে আর ভীড় বাড়িও না। আর একটা বিষয়ে তারিককে সতর্ক করেছিলাম, খবরদার! খবরের কাগজ আনবে না, আমি চাইলেও আনবে না। তাইতো তিন দিন ধরে 'নিউ মর্ডার্ণ প্যারিসে' কাটাবার পর এক কাপ কফি খেতে গিয়েছিলাম নেহেরু পার্কের রেস্টুরেণ্টে।

তিন দিন পর কিছু মানুষ দেখে বোধহয় একটু ভালই লেগেছিল। পরের দিন বিকালেও গেলাম। সেদিনও বেশ লাগল। তারপর থেকে বিকালের দিকে এক কাপ কফি খাবার অছিলায় কিছু নতুন মানুষ দেখার লোভে রোজই যেতাম নেহেরু পার্কের ঐ রেস্টুরেণ্টে।

সেদিনও একই উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। কফি খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। ঠিক উঠব উঠব ভাবছি এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এসে রত্না বলল, বাচ্চুদা আপনি এখানে ?

আমাকে দেখে রত্না যতটা অবাক হয়েছিল, আমিও ওকে দেখে ঠিক ততটাই বিস্মিত হয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথা থেকে ?

মাত্র ঐ ক'টি মুহূর্তের মধ্যেই রত্নার সব চাঞ্চল্য, সব উচ্ছ্বাস বিদায় নিল। সারা মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেল। কেমন যেন হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে গেল রত্না। সেদিন বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম রত্না পাল্টে গেছে। কেন সে নিষ্প্রভ হয়েছিল সেদিন, কেন তার সব উচ্ছ্বাস বিদায় নিয়েছিল মাত্র এ ক'টি মুহূর্তের মধ্যে, সেসব কিছুই বুঝতে পারিনি।

রত্না শুধু বলেছিল, মাসখানেক হলো আমি লণ্ডনের সংসার তুলে চলে এসেছি। একটু থেমে বলেছিল, মন মেজাজ বিশেষ ভাল না ; তাই বাবা-মা'র সঙ্গে বেড়াতে এসেছি।

আমি আর উঠলাম না। রত্নাকে বললাম, বসো কফি খাবে তো ?

মুখে কোন উত্তর দিল না। জিভ দিয়ে নীচের ঠোঁটটা একটু কামড়াতে কামড়াতে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল আমার প্রস্তাবে।

কফি খেতে খেতে আমি বললাম, কি আশ্চর্য এই দুনিয়াটা ! কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি শ্রীনগরে তোমার দেখা পাব।

'ঠিক বলেছ বাচ্চুদা, দুনিয়াটা বড় আশ্চর্যের জায়গা। মানুষ যা চায়, যা ভাবে তা হয় না। আর যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, ঠিক সেটাই জীবনে ঘটবে।' কফির কাপ থেকে মুখটা উঁচু করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই না বাচ্চুদা ?

আমি একটু মুচকি হেসে বললাম, ঠিক বলেছ।

কফি খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে নেহেরু পার্কে একটু ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, লণ্ডন থেকে কবে দেশে ফিরলে ?

রত্না যেন কেমন আনমনা ছিল। মনে হলো আমার কথা শুনতে

পায়নি। আবার প্রশ্ন করলাম, কবে দেশে এলে?

'এইতো কিছুদিন হলো ; এখনও একমাস হয়নি।'

'বিনয় ডাক্তার কেমন আছে?'

'কি বললেন?'

'বিনয় ডাক্তার কেমন আছে?'

'ও!' একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল রত্না। বলল, খুব ভালো।

আরো কয়েক মিনিট ঘুরে বেড়ালাম পার্কের মধ্যে। এতদি পর এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমার সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু তবু কথাবার্তা বলার বিশেষ তাগিদ না দেখে মনে হলো, রত্নার মনমেজাজ বোধ হয় ভাল নেই।

রত্নাকে পৌঁছে দিলাম ওদের হাউস বোটে, দি প্যারাডাইসে। আমাকে দেখে ওর বাবা-মা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিন বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমার হাউস বোটে।

মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে গিয়েছিল, মাথাটাও কেমন যেন ঝিম ঝিম করছিল। হাত-পা ছড়িয়ে ড্রইং রুমে সোফার 'পর শুয়ে পড়লাম। তারিক একটু উতলা হয়ে আমার তবিয়তের খবর নিল। আমি ওকে নিশ্চিন্ত হতে বলে একটু চোখ বুজলাম। ডিনার খাবার জন্য তারিক ডেকেছিল কিন্তু আমি আর উঠিনি।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বেশ জ্বর হয়েছে। সারা-দিন চুপচাপ শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। বিকেলে কফি খেতেও বেরুলাম না। সন্ধ্যার পর ছাদে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে আবছা চাঁদের আলোয় দূরের হরিপর্বত দেখছিলাম। ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। কার যেন একটা ঠাণ্ডা হাত কপালে লাগতেই চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি রত্না।

'কি ব্যাপার? তুমি?'

রত্না আমার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল, জ্বর হয়েছে একটা খবর তো দিতে পারতেন।

একটু মুচকি হেসে রত্নার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলাম। বললাম, তারিককে একটু ডাক দাও না, কফি খেতাম।

'তারিককে একটু আমাদের বোটে পাঠিয়েছি, এখুনি আসছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রত্নার বাবা-মা এসে হাজির। মহা ব্যস্ত হয়ে চ্যাটার্জী সাহেব আমার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, জিভ দেখলেন, কপালে বুকে হাত দিলেন। তারপর তাঁর ছোট্ট এ্যাটাচি থেকে কি যেন একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বের করে আমাকে খাইয়ে দিলেন।

পরের দুটি দিন মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জী এসেছিলেন আমাকে দেখতে। রত্নাও এসেছিল, তবে হিসেব করে নয়। সকালে এসেছে, দুপুরে এসেছে, এসেছে সন্ধ্যায় ও রাত্তিরে। আমার তদারক করেছে, আমার সঙ্গে গল্প করেছে। দুটি দিন পরেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম, কিন্তু তবুও রত্না আসত, আসত গল্প করতে, গল্প শুনতে।

কয়েকদিন পর লক্ষ্য করলাম, রত্না কি যেন আমাকে বলতে চায় অথচ বলে না বা বলতে পারে না। একটি একটি করে দিন চলে যায়, আমার শ্রীনগরত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় মিস্টার ও মিসেস চ্যাটার্জী রত্নাকে নিয়ে এলেন আমার হাউস বোটে। অনেক গল্পগুজব হলো। শেষে ওঁরা বিদায় নিলেন।

রত্না বলল, মা তোমরা যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

রত্না আর দেরী করেনি। সেদিন রাত্রে আমার হাউস বোটের ছাদে বসে আবছা চাঁদের আলোয় রত্না তার জীবননাট্যের নাতিদীর্ঘ অথচ ঘটনাবহুল কাহিনী শুনিয়েছিল আমাকে। নির্বাক, নিশ্চল, মন্ত্র-মুগ্ধের মতো সে কাহিনী শুনেছিলাম আমি।

দুই

প্রথম মাস দুই সারা লণ্ডন শহরটাকে চষে ফেলল কিন্তু তবুও কোন সুরাহা করতে পারল না অলক। পরে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচয় হয় এক ইংরেজ সাংবাদিকের সঙ্গে এবং শেষে তাঁরই সাহায্যে

ফ্রীট স্ট্রীটের এক আধাখ্যাত সাপ্তাহিকের আর্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি পায়। অলকের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ডিরেক্টরের সুপারিশে ছ'মাসের মধ্যে অলকের মাইনে বারো থেকে পনেরো পাউণ্ড হলো।

মাইনে বাড়ার পর অলক বাসা পাল্টাল। গোল্ডর্স গ্রীনে একটা ছোট্ট দু'খানা ঘরের ফ্ল্যাট নিলো। একখানা ঘরে ষ্টুডিও হলো। বেডরুমের কোন এক কোণায় রান্নার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ীতে একটু আধটু চা-কফি ছাড়া আর কিছু অলক করতে পারত না। নতুন নতুন যারা দেশ থেকে যায় তারা অবশ্য এর চাইতে বেশী কিছু পারে না। দু'চার মাসের মধ্যে সবাইকে রান্না-বান্না শিখে নিতে হয়। অলক সে তাগিদটুকুও বোধ করত না। সকাল বেলায় দু'এক কাপ চা খেয়ে অফিস বেরুবার পথে গোল্ডর্স গ্রীন স্টেশনের পাশে একটা ইটালীয়ান রেস্তোরায় হেভী ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিত। দুপুরে লাঞ্চের টাইমে ফ্রীট স্ট্রীটের কোন না কোন রেস্টুরেন্টে দু'একটা স্যাণ্ডউইচ আর এক কাপ কফি খেতো।

বিকেলে অফিস ছুটির পর প্রায়ই চারিং ক্রশ অবধি হেঁটে আসত। কোনদিন ষ্ট্রাণ্ড, কোনদিন ভিক্টোরিয়া এম্বব্যাঙ্কমেণ্ট ধরে হেঁটে আসতে আসতে অলকের বেশ লাগত মানুষের ভীড় দেখতে। ষ্ট্রাণ্ডের উইণ্ডো শপিংও মন্দ লাগত না। কিছুকাল পরে যখন এসব পুরনো হয়ে গেল তখন সোজা চলে আসত নিজের ফ্ল্যাটে। নিজের ষ্টুডিওতে কাজ করত অনেক রাত অবধি।

ল্যাণ্ডস্কেপের চাইতে জীবন্ত মানুষের পোট্রেট আঁকতেই অলকের বেশী ভাল লাগত। প্রথম দিন ইজেলের সামনে রং তুলি নিয়ে বসবার সময় ভেবেছিল সামনের ফ্ল্যাটের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পোট্রেট আঁকবে। কিন্তু তাই কি হয়? যার স্মৃতি, যার ভালোবাসা অলকের জীবন যাত্রার একমাত্র পাথেয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কবিতারই পোট্রেট আঁকল অলক। একটির পর একটি করে চার রকমের চারটি পোট্রেট আঁকল কবিতার। স্টুডিওর চার দেওয়ালে ঝুলনো হলো সেই চারটি পোট্রেট। রিভলবিং একটা টুলের 'পর বসে অলক ঘুরে ঘুরে দেখত সে পোট্রেট-

গুলো আর মনে মনে বলতো কবিতা, তুমি আমার কাছে নেই, পাশে নেই সত্য কিন্তু আমার জীবনের চতুর্দিকে থেকে তুমি আমার সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছ। এই বিদেশ বিভূঁইতে শুধু তুমিই আমাকে চতুর্দিক থেকে রক্ষা করবে।

বেডরুমে একলা একলা ঘুমুতে মন টিকত না। প্রায়ই মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেত। ছুটে আসত ষ্টুডিওতে। বাকি রাতটুকু কবিতার চারটি পোট্রেট দেখে কাটাত অলক।

তারপর মাস কয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে কবিতার একটা লাইফ-সাইজ পোট্রেট তৈরী করল অলক। জীবনের এত দরদ দিয়ে, এত ভালবাসা দিয়ে মনের সমস্ত সত্ত্বা, সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে পর পর ক'টি রাত জেগে পোট্রেটের ফিনিশিং টাচ দিয়েছিল অলক। যে কবিতাকে নিজের জীবনে, নিজের সংসারে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, তাকেই রং-তুলি নিয়ে বরণ করে তুলল শিল্পী অলক, প্রেমিক অলক। এই নতুন পোট্রেটকে দেবীর মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করল নিজের বেড-রুমে।

পরবর্তী কিছুকাল অফিস ছাড়া অলক বাকী সময়টুকু কাটিয়েছে কবিতার পোট্রেট দেখে, তাদের সঙ্গে কথা বলে, গান গেয়ে, আর পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে। মন কিন্তু এইখানেই স্থির হতে পারেনি, সে আরো এগিয়ে গেছে। মন চেয়েছে সমস্ত কিছু দিয়ে কবিতাকে গ্রহণ করতে, তাকে প্রাণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দেহের প্রতিটি সত্ত্বা, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করতে।

মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তো দুনিয়া চলে না। মনের হুকুম মেনে চললে দুনিয়াটা হয়তো আরো সুন্দর, আরো মনোরম হতো। কিন্তু তা হয়নি। হবারও নয়। অলকের সে উপলব্ধি হলে আর সহ্য করতে পারেনি, কবিতার পোট্রেট ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছে। সারারাত্তির কেঁদেছে। সারাদিন কেঁদেছে।

বেশীদিন আর এমনি ভাবে কাটাতে পারেনি। অফিস ফেরার পথে কোনদিন বড় একটা বোতল সঙ্গে এনেছে। দেবদাসের মতো

ঢক্ ঢক্ করে গিলেছে সে বিষ। মাতাল হয়ে ভুলতে চেয়েছে কবিতাকে। পারেনি। বরং আরও মনে পড়েছে। মনে পড়েছে এলাহাবাদ টেগোর সোসাইটিতে গান গাইবার কথা। কবিতা হারমোনিয়াম বাজিয়েছিল আর অলক গেয়েছিল, 'আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে,' 'আমি তোমায় সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।'

বোতলের শেষটুকু পর্যন্ত খেয়েছে। ভেবেছে তাল সামলাতে পারবে না। অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে বাকি রাতটুকু সমস্ত অতীত স্মৃতি-ভার থেকে মুক্ত থাকবে। সব হিসাব-নিকাশ উল্টে-পাল্টে গেছে।

বন্ধুহীন, প্রিয়হীন অলকের দিন এইভাবেই কাটছিল। পরে বিধাতা পুরুষের অসীম কৃপায় ডুরী লেন থিয়েটারের পাশের একটা ছোট্ট গলির মধ্যে একটা 'পাবে' অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হলো ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে। প্রায় প্রথম দর্শনেই অলককে ভাল লেগেছিল ডাক্তারের। ভাবভোলা উদাস নিঃসঙ্গ ব্যর্থ প্রেমিক শিল্পীকে কার না ভাল লাগবে? ডাক্তারের মধ্যে সমবেদনশীল দরদী মনের স্পর্শ পেয়ে অলক প্রায় কৃতার্থ হয়েছিল।

রোজ সম্ভব হতো না, কিন্তু প্রায়ই দুজনে মিলতো। কোন দিন কোন 'পাবে' এক জাগ বিয়ার নিয়ে, কোনদিন চিপস খেতে খেতে ভিক্টোরিয়া এম্বব্যাঙ্কমেণ্টে হাঁটতে হাঁটতে, কোনদিন আবার মার্বেল আর্চের পাশে বা হাইড পার্কের কোণায় বসে বসে দুজনে গল্প করেছে, আড্ডা দিয়েছে। অলকের আহত মন ডাক্তারের ভালবাসার ছোঁয়ায় মুগ্ধ হয়েছিল। শুধু তাই নয় একদিন এক দুর্বল মুহূর্তে উজাড় করে দিয়েছিল নিজের স্মৃতি, বলেছিল কবিতাকে ভালবাসার ইতিহাস আর তার ব্যর্থতার কাহিনী।

জানো ডক্টর, বাবা নিজে ওস্তাদ ছিলেন বলে তিনি চাইতেন আমি গান শিখি, ওস্তাদ হই, তাঁর ঐতিহ্য, তাঁর ধারা রক্ষা করি। ছোট-বেলায় বাবার কাছেই গান শিখেছি। সবাই বলতো আমার নাকি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমার কিন্তু মন বসতো না। আমি চাইতাম ছবি আঁকতে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই বাবা মারা গেলেন। আর

আমার গানের চর্চাও বন্ধ হলো। ভর্তি হলাম বোম্বে, জে, জে, স্কুল অফ আর্টস-এ।

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় মা মারা গেলেন। ছুটিতে এলাহাবাদ যাবার তাগিদ ও আকর্ষণ দুটোই কমে গেল। তাছাড়া দাদা বৌদির সংসারে আমার আসনটা ঠিক মজবুত ছিল না। আমার কাছে এলাহাবাদের একমাত্র আকর্ষণ ছিল আমার ছোট্ট ভাইঝি ময়না। দীর্ঘ দুটি বছর ওকে না দেখে মনটা বড়ই উতলা হয়ে উঠেছিল। বড্ড ইচ্ছে করছিল ওকে আদর করতে। তাছাড়া ও যখন খুব ছোট্ট ছিল তখন থেকেই আমার কাছে রং-তুলি নিয়ে খেলা করত, গান শিখত। ইতিমধ্যে খবর পেলাম ময়না ভীষণ অসুস্থ। ফাইন্যাল পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, তার পরের দিনই বোম্বে মেলে চেপে পড়লাম। এলাম এলাহাবাদ।

মাস খানেক ধরে ময়নাকে নিয়ে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলল। তারপর ময়না ভাল হয়ে উঠল। ভেবেছিলাম বোম্বে ফিরে একটা চাকরি জোগাড় করব আর একটা ছোট্ট ষ্টুডিও খুলব। কিন্তু ময়না কিছুতেই ছাড়ল না। পৃথিবীতে শুধু ময়না ছাড়া আর কেউ আমাকে ভালবাসত না। তাই তাকে কাঁদিয়ে, তাকে প্রতারণা করে, তার ভালবাসার অপমান করে চোরের মতো পালিয়ে যেতে মন চায়নি। আমি বাধ্য হয়ে থেকে গেলাম এলাহাবাদে।

অলক থামেনি, আরো এগিয়ে গিয়েছিল। কিছু মাত্র দ্বিধা না করে, কার্পণ্য না করে তার চোখের জলের পূর্ণ ইতিহাস শুনিয়েছিল ডাক্তারকে।

…টেগোর সোসাইটি থেকে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে অলককে গান গাইতে ধরল পাড়ার ছেলেরা। অনেক দিন চর্চা নেই বলে তাদের অনুরোধ এড়িয়ে গেল। শেষে অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পীর গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টেগোর সোসাইটির সেক্রেটারী মাইক্রো-ফোনে ঘোষণা করলেন, আজকের অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী অলক মৈত্র।

নিরুপায় হয়ে অলককে গান গাইতে হয়েছিল। হারমোনিয়াম

বাজাবার অভ্যাসটা ঠিক ছিল না। তাই বিশেষ অনুরোধে সেদিনের নির্ধারিত অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী কবিতা বাজিয়ে ছিল হারমোনিয়াম। প্রথমে ভেবেছিল একটি গান গাইবে, কিন্তু শ্রোতাদের দাবী ও কবিতার অনুরোধের মর্যাদা রাখবার জন্য অলককে চার চারটি গান গাইতে হয়েছিল। শ্রোতাদের নমস্কার করে স্টেজ থেকে উঠে উইং স্ক্রীনের পাশে এসেই অলক ধন্যবাদ জানিয়েছিল কবিতাকে। 'আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। এই আনাড়ীর সঙ্গে বাজাতে আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু তবুও যে ধৈর্য ধরে বাজিয়েছেন তার জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।'

কবিতা বলেছিল, থাক্ থাক্ অনেক হয়েছে। ধন্যবাদ জানাব আপনাকে।

'কেন বলুন তো? কি অপরাধ করলাম?'

'সত্যি বলছি, চমৎকার গান গেয়েছেন। বড্ড ভাল লেগেছে।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'আমাকে কি এতই অসভ্য মনে হচ্ছে যে প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করব!'

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো কবিতাকে একদিন ভাল করে গান শোনাবে অলক।

প্রয়াগতীর্থ এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার মতো অলক আর ছোট্ট ময়নার স্নিগ্ধ শান্ত জীবনে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সবার অলক্ষ্যে অন্তঃসলিলা সরস্বতী এসে মিশে গেল।

জীবনের সেই পরম লগ্নে প্রথম প্রেমের উন্মাদনায় দুজনেই একটু বেহিসেবী হয়ে পড়েছিল। সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর যখন প্রথম সূর্য ওঠে তখন সমস্ত রাঙিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করে। সারা রাত্রির মৌনের পর যখন পাখীর ঘুম ভাঙে, যখন দিনের আলোর প্রথম ইঙ্গিত পায়, অনাগত সূর্য-কিরণের প্রথম স্পর্শের সামান্যতম অনুভূতি উপলব্ধি করে, তখন তার কলকাকলী সারা বিশ্বকে জাগিয়ে দেয়। একটু বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের রক্তিম আভা বিদায় নেয়, পাখীদের কল-

কাকলীও থেমে যায়। পরিচয়ের পর্ব শেষ হবার পর যখন দুজনকে সম্যকভাবে আবিষ্কার করল, উপলব্ধি করল, তখন সে উন্মাদনা, সে আধিক্য বিদায় নিল।

খসরুবাগের পিছন দিকের বাগানে কবিতার প্রথম পোর্ট্রেট আঁকল অলক। কবিতা স্থির হয়ে বসতে পারে না বেশীক্ষণ। দশ-পনেরো মিনিট পরপরই ছটফট করে উঠত। অলক তাকে ধরে নিয়ে বসিয়ে দিত। মুখটা নড়ে গেলে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঠিক করে দিত, লম্বা বিনুনীটা আবার পেছন থেকে টেনে এনে সামনে বুকের 'পর ঝুলিয়ে দিতো ঠিক আগের মতো করে। আবার দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে সব কিছু ঠিক রেখেও এ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে দিত কবিতা। একটু বকে, একটু আদর করে আবার ঠিক করে নিত অলক।

পোর্ট্রেটটা যখন শেষ হলো তখন চমকে উঠেছিল কবিতা। দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলেছিল, আঃ ওয়াণ্ডারফুল!

ভাবের বন্যায়, তৃপ্তির আনন্দে, ভালবাসার আতিশয্যে কবিতা দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল অলককে। আর অলক? গঙ্গার মতো স্নিগ্ধ শান্ত অলক হঠাৎ পদ্মার মতো পাগল হয়ে উঠেছিল কবিতার প্রথম আলিঙ্গনে, কেউটে সাপের বিষের মতো ভালবাসার বিষ ঢেলেছিল কবিতার দুটি ওষ্ঠে।

মিনিট দুই পরে দুজনেরই সম্বিত ফিরে এসেছিল। দুজনেই লজ্জায় চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। লজ্জায় কারুর মুখ দিয়েই কথা বেরোয়নি বেশ কিছুক্ষণ। প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙ্গল অলক, 'কবিতা।'

'উঃ।'

'রাগ করলে?'

কোন উত্তর দেয় না কবিতা। শুধু মুচকি হাসে।

অলক আবার প্রশ্ন করে, বল না কবিতা, রাগ করেছ?

কবিতা আলতো করে অলকের কাঁধে মাথা রেখে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, উঁহু!

এরপর অলক-কবিতার জীবন থেকে যেন শীতের জড়তা কেটে

গেল, যেন কোন ইঙ্গিত না দিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল দুটি প্রাণের গ্রহণ রাজ্যে! প্রায় ঝড়ের বেগে দুরন্ত বর্ষার পদ্মার মতো দুটি জীবন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চললো।

এলাহাবাদের পরিচিত মানুষের ভীড়ের মধ্যে সীমিত স্বাধীনতায় মন ভরে না। দুটি প্রাণ, দুটি মন, দুটি আত্মা অন্তহীন আকাশের তলায় দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরের স্বাধীন পরিবেশে মিলতে চায়, চায় ভালবাসার প্রয়াগতীর্থে বিলীন হয়ে যেতে।

অলক বলে, জানো ডক্টর, কামনাবৃত্তির মধ্যে ভালবাসা না থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাসার মধ্যে নিশ্চয়ই কামনাবৃত্তি লুকিয়ে থাকে। রক্ত-মাংসের মানুষ এর ঊর্ধ্বে যেতে পারে না, আমরাও পারিনি। দুজনেই সে আগুনের উত্তাপ উপলব্ধি করেছিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করে সে আগুনে আহুতি দিতে পারিনি।

দুজনেই ঠিক করলাম, আর কিছু না হোক অন্তত লোকারণ্যের বাইরে সমাজের শ্যেন চক্ষুর আড়ালে দুজনে নিঃসঙ্গ তীর্থ যাত্রা করব, আগামী দিনের ইতিহাসের বনিয়াদ তৈরী করব। কবিতা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু পূর্ণিমার সঙ্গে পূর্ণিমার দিল্লীবাসী মামার কাছে যাবার অনুমতি নিল বাবা-মার কাছ থেকে। আমিও গেলাম। উদয় অস্ত ঘুরে বেড়িয়েছি দুজনে। হেসেছি, খেলেছি, আনন্দ করেছি, করেছি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে পাকাপাকি।

পূর্ণিমার মামা গাড়ীতে করে আগ্রা-জয়পুর দেখার প্রোগ্রাম করলেন। হঠাৎ যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় কবিতা জানাল, তার শরীর খারাপ। মামা প্রোগ্রাম বাতিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কবিতা বলেছে, তা হয় না মামা। মামা বার বার আপত্তি করেছেন, কবিতাও বার বারই প্রতিবাদ করেছে। শেষে মামা মামীমাকে রেখে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু তখন পূর্ণিমা বলেছে, না মামা, তা হয় না। মামী না গেলে আমিও যাব না। মামা ঠিক রাজী হতে পারেন নি, কিন্তু পূর্ণিমা বলেছে, দুটো দিন আমাদের ছাড়া থাকলে কবিতা উড়ে যাবে না। বেশ থাকতে পারবে।—তাছাড়া বুড়ো রামনাথ তো রইলো।

মামা-মামী পূর্ণিমা রওনা হবার পরই কবিতার শরীর ঠিক হয়ে গেল। কবিতাকে নিয়ে সেদিন আমি গেলাম রিজ-এ। অনেক গল্প, অনেক গান হলো, ভবিষ্যত নিয়েও অনেক আলোচনা হলো। স্থির হলো, এবার এলাহাবাদ ফিরে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই দুটি জীবন একই গ্রন্থীতে বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর দুজনে চলে যাবো বোম্বে, খুলব ষ্টুডিও।

কিছু পরে কবিতাকে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করালাম। আর আমি রং-তুলি দিয়ে প্রাণহীন ক্যানভাসে আমার মনের প্রতিমাকে গড়ে তুলতে শুরু করলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোটামুটি স্কেচটা করে নিলাম। কবিতা আর স্থির থাকতে পারল না। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে করতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আমি অনেকবার বারণ করলাম, কবিতা, এতো হুড়োহুড়ি কোরো না। হঠাৎ কোন পাথরে চোট লেগে যাবে। আমি যত বারণ করি, আমাকে রাগাবার জন্য ও তত বেশি দৌড়াদৌড়ি করে। শেষে হঠাৎ একবার একটা গোল পাথরের 'পর পা পড়া মাত্র কবিতা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল অনেকটা দূরে। মনে পড়ে ওর শুধু একটা বিকট চীৎকার শুনেছিলাম। আমি দৌড়ে লাফিয়ে গেলাম ওর পাশে। দেখি আধা-শুকনো মোটা ডালে খোঁচা খেয়ে হাত পা রক্তারক্তি হয়েছে। চীৎকার করে ডাক দিলাম, কবিতা ?

কোন সাড়া পেলাম না। মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল, মনে হলো মাটিটা কাঁপছে, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, কবিতাকে বাঁচাতে হবে। ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে একটু ভাল করে নজর করতে দেখলাম জ্ঞান নেই। আর দেখলাম সারাটা কাপড় রক্তে ভিজে উঠেছে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই আবিষ্কার করলাম একটা মোটা ডাল ওর উরুতে কয়েক ইঞ্চি ঢুকে গেছে আর সেখান দিয়ে রক্ত বইছে।

অলক সেদিনের ভয়াবহ স্মৃতির কথা স্মরণ করে ভয়ে-আতঙ্কে শিউরে উঠল। ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বলল, আমি আর বিন্দু-

মাত্র দ্বিধা না করে ডালটাকে টেনে বের করলাম। ওর শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে ওখানে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম।

ডাক্তার এতক্ষণ মুখ বুজে শুধু শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর ?

তারপর ওকে নিয়ে গেলাম দিল্লীর উইলিংডন হাসপাতালে। এমার্জেন্সীতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররা দল বেঁধে ঢুকল অপারেশন থিয়েটারে। অনেকক্ষণ ধরে অপারেশন হলো। সতেরোটা ষ্টিচ করতে হয়েছিল।

ডাক্তার মুখার্জী একটু চমকে উঠলেন, ভ্রূ দুটোও কুঁচকে উঠল।

অলক বলল, শুধু শুনেই ঘাবড়ে যাচ্ছো ডক্টর! আর ভেবে দেখো তো আমার সেদিনের অবস্থা।

অলকের চোখের 'পর থেকে ডাক্তার দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে কি যেন চিন্তা করে নিল।

অলক বলেছিল, তারপরের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলে লাভ নেই। শুধু জেনে রাখ, পূর্ণিমা আর মামা-মামীমার অসীম কৃপায় কবিতা ভাল হয়ে উঠল আর আমরা দুজনেই অনেক অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেলাম! কবিতা যখন এলাহাবাদ ফিরে গেল, তখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। দিল্লীর রিজ-এর কাহিনী, অপারেশনের খবর কেউ জানল না। পূর্ণিমা আর ওর মামা-মামী ছাড়া কবিতার অপারেশনের খবর আজো কেউ জানে না।

পৃথিবীর অসংখ্য প্রেমের কাহিনীর মতো অলক-কবিতার প্রেম বাস্তবে সাফল্য লাভ করেনি। একটা সামান্য আর্টিষ্টের সঙ্গে যে কবিতার বিয়ে হওয়া অসম্ভব, সে কথা অলককে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন ওর বাবা, দাদা। এতদিন যে কথা, যে কাহিনী এলাহাবাদের কেউ জানতো না, হঠাৎ এতদিন পরে সে কাহিনী জর্জ টাউন, টেগোর টাউন, কটরা, সিভিল লাইন্সের সব বাঙ্গালী মহলে ছড়িয়ে পড়ল।

কবিতা-বিহীন জীবনে অলক সহ্য করতে পারেনি এই অপমানের

ঝড়। একদিন গভীর রাতে ময়না ঘুমিয়ে পড়ার পর অলক দেশত্যাগী হলো।

'জানো ডাক্তার, আর একবার দিল্লী দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করল। তাই সব চাইতে প্রথম এলাম সেখানে। রিজ-এর চারপাশে, উইলিংডন হাসপাতালের পাশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে কিছুটা চোখের জল ফেলে কবিতার উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা জানালাম, তার ভালবাসার স্মৃতি রোমন্থন করে অনেক দুঃখের মধ্যেও নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেলাম। শেষ দিন পূর্ণিমার মামা-মামীকে প্রণাম করে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিলাম।'

অলকের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। গলার স্বরটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবুও থামল না।

'মা, ময়না আর কবিতা এই তিন জনের তিনটি ছবি আর মাত্র দশটি পাউণ্ড সম্বল করে চড়ে পড়লাম প্লেনে। এলাম তেহেরান। তেহেরান থেকে বাগদাদ্, বাগদাদ্ থেকে কায়রো, কায়রো থেকে আথেন্স, তারপর রোম, জুরিখ, জেনেভা, ফ্রাঙ্কফার্ট, প্যারিস ও সব শেষে এই হতচ্ছাড়ার দেশে। ন'মাস ধরে ঘুরেছি এইসব দেশে। যে কবিতাকে আমি পেলাম না আমার জীবনে, সেই কবিতার অসংখ্য পোর্ট্রেট এঁকেছি। জীবন ধারণের জন্য সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে সে সব পোর্ট্রেট দিয়ে এসেছি ঐসব দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষেয় হাতে। আমার ঘরে আমি কবিতাকে কোন মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না, তাইতো মর্যাদার সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা করে এলাম অসংখ্য মানুষের সংসারে।'

প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল অলক। তবুও বেশ খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, এখানে এসেও কবিতার পোর্ট্রেট এঁকেছি ; একটি নয় দু'টি নয়, অনেকগুলি। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে আজ আর তার পোর্ট্রেটগুলো কাউকে দিতে পারব না।

একটু চুপ করল অলক। শেষে বলল, ভাই ডক্টর, এই দেশেও আমার মন টিঁকছে না। কয়েকদিনের মধ্যেই ইমিগ্রেশন নিয়ে কানাডা

চলে যাচ্ছি। ডাক্তার মুখার্জীর হাতটা চেপে ধরে বলল, ডক্টর, বোধ-হয় তোমাকেও ভালবেসে ফেলেছি। এ ফাঁদে আমি আর পা দেবো না। তাই তোমার সঙ্গেও আর বিশেষ যোগাযোগ রাখব না বা রাখতে পারব না। তবে কানাডা যাবার আগে তোমার হাতে আমার কবিতার পোর্ট্রেটগুলো দিয়ে যাবো। একটু মর্যাদার সঙ্গে ওগুলো রক্ষা কোরো।

এবার ডাক্তারকে জড়িয়ে ধরল। বলল, আর একটা শেষ অনুরোধ আছে তোমার কাছে। যদি কোনদিন কবিতার দেখা পাও বোলো, আমি আজও ভুলতে পারিনি তাকে। বোলো, আজও বোধহয় আমি তাকে ভালবাসি। সে আর তার স্বামী যেন আমাকে ক্ষমা করে। ডক্টর! আর যদি কোনদিন কোন কারণে সুযোগ আসে তবে আমার ময়নার একটু খোঁজ কোরো, একটু আদর কোরো আমার হয়ে।

ডাক্তার আর অলক দুজনেই চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় নিল সে রাত্রে। দিন তিনেক পরে অলক তার গোল্ডর্স গ্রীনের ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল ডাক্তারকে। কবিতার পোর্ট্রেটগুলো দেখে ডাক্তার যেন ভূত দেখার মতো আঁতকে চমকে উঠেছিল। অলক জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হলো ডক্টর?

কোনমতে সামলে নিয়ে ডাক্তার জবাব দিল, না, কিছু না। এত-গুলো সুন্দর পোর্ট্রেট দেখে চমকে না উঠে কি করি বলুন!

পোর্ট্রেটগুলো নেবার আগে ডাক্তার শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল আচ্ছা ধরুন, যদি কোনদিন আপনার কবিতার দেখা পাই, আর তাঁকে যদি একটা পোর্ট্রেট দিতে হয়, তবে কোন্‌টা দিলে আপনি সুখী হবেন?

'ডক্টর, যদি কোনদিন কবিতার দেখা পাও তবে সে ভারটা তাকেই নিতে বোলো।'

ডাক্তার মুখার্জী ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন।

অলক তাঁর শূন্য মন্দিরে ফিরে এসে প্রায় উন্মাদের মতো চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

তিন

'জানেন বাচ্চুদা, আপনার বিনয় ডাক্তার আমার অতগুলো পোর্ট্রেট নিয়ে আসতেই হঠাৎ আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। অতীত বর্তমানের সমস্ত স্মৃতি যেন আমাকে উন্মাদ করে তুলল। সেদিন যে কিভাবে নিজেকে সংযত রেখেছিলাম, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আর কেউ না।'

অনেক রাত হয়েছিল। হাউস বোটের ছাদে বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। কিন্তু তবুও দুজনের কেউই নড়তে পারলাম না।

রত্না আঁচল দিয়ে আর একবার চোখের জল মুছে নিল। বলল, আপনার ডাক্তার বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ করল না। কিন্তু দিন কতক আগে আমার উরুর অপারেশন নিয়ে আলাপ-আলোচনা আর সেদিনের পোর্ট্রেট আনার সঙ্গে আমার চোখের সামনে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠল। যথারীতি ডিনার খেতে বসলাম দুজনে। আমার গলা দিয়ে কিছু নামতে চাইছিল না। ডাক্তার কিন্তু অন্য দিনের চাইতে সেদিন অনেক বেশী খেয়েছিল। অন্য দিন একটার বেশী ফিস ফ্রাই খায় না, সেদিন আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিন তিনটে খেলো। দু'বার করে ভাত আর মাছ চেয়ে নিল।

রত্নার গলা দিয়ে আর স্বর বেরুচ্ছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কিন্তু তবুও ওকে কিছু বলতে পারলাম না।

একটু কাশল, একটু চোখের জল মুছে নিয়ে আবার শুরু করল, আজ আর আপনার কাছে কিছু গোপন করব না। সব কিছু বলে কিছুটা হাল্কা হতে চাই।

রত্নার মন হাল্কা হয়েছিল কিনা জানিনা। তবে বলেছিল, ডাক্তার সে রাত্রে ওকে অনেক আদর করেছিল, ভালবাসায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে চরম আনন্দ দিতেও কার্পণ্য করেনি। তারপর দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রত্নার চোখে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি। কিন্তু বিধাতা পুরুষের বিধান

কে খণ্ডাবে। শেষ রাত্তিরের দিকে সর্বনাশা ঘুম তাকে গ্রাস করল।

অন্য দিনের চাইতে পরের দিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল রত্নার। হাসপাতালে ডাক্তারের ডিউটি আটটা থেকে। সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা হয়। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজে দেখে চমকে উঠল রত্না। কিন্তু ডাক্তারকে তখনো ঘুমিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন আঁতকে উঠল!

রত্না আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাচ্চুদা, একটু পরে একটু নাড়া চাড়া করতেই দেখলাম সব কিছু শেষ। পাশে দেখি স্লিপিং পিলের দুটো খালি শিশি পড়ে আছে। বালিশের তলায় একটা চিঠি পেয়েছিলাম·····

রত্না, আমি যাচ্ছি, দুঃখ কোরো না। তোমাকে আমি ভালবেসেছি, কিন্তু সে ভালবাসা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা। তার বেশী কিছু নয়। তুমি যাঁর কবিতা, সেই অলক আর তোমার সারা মনকে বঞ্চনা করে রত্নাকে উপভোগ করার কোন অধিকার আমার নেই।

রত্না, আমি যাচ্ছি, আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। তবে আগামী জন্মে নয়। আগামী জন্মে তুমি নিশ্চয়ই অলককে পাবে। তার পরের জন্মে আমি আসব তোমার কাছে।

আমার জন্য তুমি চোখের জল ফেলো না। আমি তো তবুও ক'টি বছর তোমার ভালবাসা পেয়েছি, তোমাকে উপভোগ করেছি, সুখে-দুঃখে তোমাকে পাশে পেয়েছি। দুঃখ হয় সেই সর্বত্যাগী শিল্পীর জন্য, যে তোমার ভালবাসার জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পৃথিবী-ময় আর শুধু তোমার ছবি এঁকে দিন কাটাচ্ছে।

আর হ্যাঁ, অলক যাবার আগে আমাকে দুটি বিশেষ অনুরোধ করেছিল। তার একটি আমি রক্ষা করার সময় পেলাম না। ওর বড় আদরের ময়নাকে একটু দেখো আর অলকের হয়ে একটু আদর কোরো।

ভগবান তোমার সহায় হোন।

তোমার বিনয়